Vol. 54 | No. 3 | 2017

Check for updates

সাহিত্য পত্রিকা

journal.bangla.du.ac.bd

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের মানসগঠন ও জীবনবোধ

Volume	54
Issue	3
Year	2017
ISSN	0558-1583
eISSN	3006-886X
Author(s)	পারভীন ববী
Published online	June 1, 2017
DOI	10.62328/sp.v54i3.9
Link to article	https://doi.org/10.62328/sp.v54i3.9
Pages	১৯৭-২২৮
Publisher	University of Dhaka
Copyright	সাহিত্য পত্রিকা
Designed and Developed by	Zobayer Abdullah

Check for updates

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের মানসগঠন ও জীবনবোধ

পারভীন ববী*

সার-সংক্ষেপ : শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বাংলাসাহিত্যের সর্বাধিক জনপ্রিয় কথাসাহিত্যিক। সমকালীন আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক কিংবা ধর্মীয় পরিপ্রেক্ষিত তাঁর মানসগঠনে পালন করেছে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা। যুগধর্মের কারণে তাঁর সাহিত্যমানসে সাধিত হয়েছে প্রগতিশীলতা ও রক্ষণশীলতার ব্যতিক্রমধর্মী সমন্বয়। ছোটগল্প ও উপন্যাসে নরনারীর চরিত্রাঙ্কনে তাঁর শিল্পীমানসের যে দ্বিধাদ্বন্দ্বময় প্রকাশ ঘটেছে তা এই প্রবন্ধে আলোচনার প্রয়াস গৃহীত হয়েছে।

বাংলা কথাসাহিত্যের ধারায় শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় জনপ্রিয়। বৃহৎ-বঙ্গের আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক ইতিহাসের এক জটিল সময়-সংক্রান্তিতে বাংলা সাহিত্যে, বিশেষত উপন্যাসে তাঁর দীপ্র আবির্ভাব। প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তর সামাজিক অবক্ষয়, মানবিক মূল্যচেতনার ক্রম-বিচ্যুতি এবং ভয়াবহ অর্থনৈতিক সঙ্কটের সময়পরিসরে শরৎচন্দ্র আবেগশাসিত ও ভাবালুতাতাড়িত যে-উপন্যাসধারা রচনা করেছেন, বাঙালি পাঠক সেখানে সহসাই অর্জন করেছে তার স্বপ্নময় জীবনের কথামালা। যে-জীবন বাংলাদেশ থেকে ক্রমঅপসৃয়মান, পাঠক সে জীবনকেই আবিষ্কার করেছে শরৎচন্দ্রের কথাসাহিত্যে। বাস্তব থেকে দূরে কল্পনার এক সংসারবলয় রচিত হতে দেখে বাঙালি-পাঠক একাত্ম হয়ে গেছে শরৎ-সাহিত্যে। সামন্তসমাজের ক্ষয়িষ্ণুতা আর আধুনিক ধনতান্ত্রিক সভ্যতা বিকাশের যুগে শরৎচন্দ্রের শিল্পীমানস সমকালকেই আত্মস্থ করেছে। কেননা, ব্যক্তিসত্তার আন্তর-বৈশিষ্ট্য এবং যুগধর্মের প্রভাবজাত চেতনালোকের সম্মিলনে গড়ে ওঠে কোন বিশেষ শিল্পীর সৃষ্টিকর্ম।

পারিবারিক উত্তরাধিকার

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের জন্ম পশ্চিমবঙ্গের হুগলি জেলার দেবানন্দপুর গ্রামে ১৮৭৬ সালের ১৫ সেপ্টেম্বর (৩১ ভাদ্র, ১২৮৩ বঙ্গাব্দ)। পিতা মতিলাল চট্টোপাধ্যায় ও

* সহকারী অধ্যাপক, ইউনিভার্সিটি ল্যাবরেটরি স্কুল এন্ড কলেজ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।

মাতা ভুবনমোহিনী দেবীর দ্বিতীয় সন্তান শরৎচন্দ্র। পিতার কর্মকুণ্ঠ স্বভাব, সংসারে তীব্র অভাব-অনটন ও দুঃখ-কষ্ট জর্জরিত বড় পরিবারের হাল টেনে ধরা মায়ের অনুযোগহীন অপরিসীম সহিষ্ণুতা শরৎচন্দ্রকে বাল্যকালেই নারীর প্রতি উদার ও সহনশীল হবার ভিত্তিভূমি তৈরিতে সাহায্য করে। শরৎচন্দ্র যে গ্রামে জন্মেছেন তা প্রাচীন সপ্তগ্রামেরই একটি অন্যতম গ্রাম। দেবানন্দপুর প্রসঙ্গে সুধীর কুমার মিত্রের বক্তব্য উল্লেখযোগ্য–

> হুগলী জেলার অন্তর্গত সপ্তগ্রাম বর্তমানে একটি নগণ্য স্থান হইলেও ষোড়শ শতাব্দী পর্যন্ত ইহা ভারতের অন্যতম প্রধান সহর এবং প্রসিদ্ধ বন্দর বলিয়া খ্যাত ছিল। সুদূর অতীতকালে বাসুদেবপুর, বংশবাটী, খামার পাড়া, কৃষ্ণপুর, দেবানন্দপুর, শিবপুর ও ত্রিশবিঘা এই সাতটি স্থানে সপ্তঋষি তপঃসাধনায় প্রবৃত্ত হইয়া সিদ্ধ হইয়াছিলেন বলিয়া ইহা সপ্তগ্রাম বলিয়া প্রখ্যাত হয় এবং গঙ্গা যমুনা সরস্বতীর সঙ্গমস্থল বলিয়া ইহা হিন্দুদিগের নিকট তীর্থক্ষেত্র বলিয়া যে পরিচিত হয়; দেবানন্দপুর সেই সপ্তগ্রামের অন্যতম গ্রাম। (অজিতকুমার, ২০০০ : ৯)

এ গ্রামে শরৎচন্দ্রের শৈশব ও কৈশোরের মাত্র অল্প কয়েকটি বছর কেটেছিল। কারণ কঠোর-কঠিন দারিদ্র্যের কারণে মতিলাল চট্টোপাধ্যায় ও ভুবনমোহিনী দেবীকে প্রায়ই ছুটোছুটি করতে হতো দেবানন্দপুর ও ভাগলপুরে। ফলে ভাগলপুরের মাতুলালয়েই শরৎচন্দ্রের শৈশবজীবনের অধিকাংশ সময় অতিবাহিত হয়েছে। সঙ্গত কারণেই এই গ্রাম ও এর পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের বহু গ্রাম, স্থান, নদনদী, পথঘাট ও প্রতিষ্ঠান তাঁর সাহিত্যে অমর হয়ে আছে। *বিরাজ বৌ*-এর নীলাম্বর ও পীতাম্বরের বাড়ি ছিল হুগলির সপ্তগ্রামে। দেবানন্দপুরের সরস্বতী নদীর বর্ণনা রয়েছে এ উপন্যাসে –

> আজ একবার এই সরস্বতীর দিকে চাহিয়া দেখ, ভয় করিবে। বৈশাখের সেই শীর্ণকায়া মৃদু-প্রবাহিণী শ্রাবণের শেষ দিনে কি খরবেগে দুই কূল ভাসাইয়া চলিয়াছে। (শরৎ রচনাসমগ্র, ২০০৫ : ৪৩)

বিরাজ বৌ রচনাকালে শরৎচন্দ্র ছিলেন বার্মায়। সেখানে অবস্থানকালেও তিনি সপ্তগ্রাম ও সরস্বতী নদীর কথা ভোলেননি। এই সরস্বতী নদীর উল্লেখ দেখি আবার *দত্তা* উপন্যাসে। *দত্তা*র নায়ক সরস্বতীর উপকূলে বসেই পুঁটিমাছ ধরেছিল। শরৎচন্দ্র ভাগলপুর থেকে ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে হুগলি ব্রাঞ্চ স্কুলের চতুর্থ শ্রেণিতে ভর্তি হন। এছাড়া *দেবদাস*, *অরক্ষণীয়া*, *শ্রীকান্ত* (চতুর্থ পর্ব) উপন্যাসে তাঁর নিজ গ্রামের বর্ণনা আছে। শরৎচন্দ্রের জন্ম দেবানন্দপুরে হলেও এ গ্রামটি কিন্তু তাঁর পূর্বপুরুষের আবাসভূমি ছিল না। তাঁর পিতা মতিলাল চট্টোপাধ্যায়, পৈতৃক বাসভূমি কাঁচরাপাড়ার নিকটবর্তী মামুদপুর থেকে দেবানন্দপুর এসে মাতুলালয়ে বাস করতেন। মতিলালের পিতা অত্যন্ত স্বাধীন প্রকৃতির মানুষ ছিলেন। প্রবল প্রতাপশালী জমিদারের সঙ্গে দ্বন্দ্ব-সংঘাতে জড়িয়ে তিনি গৃহত্যাগী হতে বাধ্য হন। অবশেষে একদিন তাঁর ক্ষতবিক্ষত

দেহ স্নানের ঘাটে মৃত অবস্থায় পাওয়া যায়। অতঃপর মতিলালের বিধবা মায়ের পক্ষে একাকী ছেলেকে মানুষ করে তোলার সামর্থ্য ছিল না। মতিলালের মা একান্ত নিরুপায় হয়ে ছেলেকে সাথে নিয়ে দেবানন্দপুরে বাপের বাড়ি চলে আসেন। মতিলালের ছেলেবেলা এই মামার বাড়িতেই কেটেছে। পরবর্তীকালে মতিলাল আর কখনো পৈতৃকভূমি মামুদপুরে ফিরে যাননি। মামারা তাঁদের বাড়ি সংলগ্ন চারকাঠা জমি তাঁকে দিয়েছিলেন, সেই জমিতে তিনি দুটি ঘর নির্মাণ করে বসবাস করেন।

একপর্যায়ে হালিশহর নিবাসী রামধন গঙ্গোপাধ্যায়ের জ্যেষ্ঠপুত্র কেদারনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের দ্বিতীয় কন্যা ভুবনমোহিনীকে মতিলাল অল্পবয়সে বিয়ে করেন। কেদারনাথ পড়াশুনার জন্য জামাতা মতিলালকে দেবানন্দপুর থেকে ভাগলপুরে নিয়ে আসেন। কেদারনাথের পিতা রামধন ১৮১৭-১৮ খ্রিস্টাব্দে হালিশহর থেকে ভাগলপুরে এসে আশ্রয় পেতেছিলেন। সেকালে ভাগলপুর বাঙালিদের পরম আকর্ষণের স্থান ছিল। কারণ এখানকার প্রকৃতি ও জলবায়ু খুবই স্বাস্থ্যকর এবং ভোগ্যপণ্য ছিল সস্তা ও পর্যাপ্ত। তাই যে সব বাঙালি একবার ভাগলপুর আসতেন তাঁরা আর নিজ এলাকায় ফিরে যেতেন না। সঙ্গত কারণেই গাঙ্গুলী পরিবারও রোগজীর্ণ, অভাবপীড়িত হালিশহরে ফিরে যাননি; ভাগলপুরেই স্থায়ীভাবে রয়ে গেলেন। গাঙ্গুলী পরিবারে একদিকে যেমন যৌথপরিবারের একান্নবর্তিতার আদর্শ বিদ্যমান ছিল অন্যদিকে তেমনি সনাতন হিন্দু রক্ষণশীল সমাজের কঠোর বিধি-নিষেধ ও অনুশাসন বিদ্যমান ছিল। ধর্মীয় গোঁড়ামি ও রক্ষণশীলতার দৃষ্টান্ত ছিল এই পরিবার। কিন্তু শরৎচন্দ্রের পিতা মতিলাল ছিলেন বাঁধনছেঁড়া, মুক্তমনা ও আত্মভোলা প্রকৃতির মানুষ। গাঙ্গুলী পরিবারের কঠোর বিধি-নিষেধ-অনুশাসনের মধ্যে তিনি ছিলেন পিঞ্জরাবদ্ধ পাখির ন্যায়, তাঁর মন ব্যাকুল ছিল মুক্ত জীবনের সাধ নিতে। তাই পরিবারের কড়া শাসন শোষণের বিপরীতে মূর্তিমান প্রতিবাদ ছিলেন মতিলাল। আর তাই বাড়ির ছোটো ছোটো ছেলেরা তাঁর কাছে অবাধ প্রশ্রয় ও অপরিমিত আদর-স্নেহ পেতো। পিতার এই অফুরন্ত স্নেহরসে শরৎচন্দ্রের হৃদয় সঞ্জীবিত হয়েছিল। এ প্রসঙ্গে সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় লিখেছেন–

> এখন বুঝিতে পারি, শাসনের প্রচণ্ড উত্তাপে শরতের হৃদয়টুকু নিঃশেষে শুকাইয়া যায় নাই কেন। পিতার অপরিসীম স্নেহের গোমুখী তাহার জীবনধারার প্রারম্ভে লোকচক্ষুর অন্তরালে মৃতসঞ্জীবনীর মতই কাজ করিয়াছিল। (অজিতকুমার, ২০০০ : ১১)

মতিলাল শৌখিন প্রকৃতির মানুষ ছিলেন; ছিলেন আবেগী। দুঃখ ও আর্থিক অসহায়ত্বের চাপেও মতিলালের স্বপ্ন ও কল্পনার কুঁড়িগুলি কুঁকড়ে যায়নি। এসব নিয়েই বরং তিনি সাহিত্যসৃজনে নিবৃত্ত হতেন। কিন্তু তাতে সযত্ন কৌশল, নিরবচ্ছিন্ন ও একনিষ্ঠ প্রচেষ্টার একান্ত অভাব ছিল। কেবল মনের খেয়াল-খুশি ও অদক্ষ হাতের ছাপই প্রকাশ পেতো। পিতার নিকট থেকে শরৎচন্দ্র উত্তরাধিকারসূত্রে অস্থির ও

উদাসীন মানসপ্রকৃতি ও সাহিত্যানুরাগ পেয়েছিলেন। শ্রীকান্তের ইংরেজি অনুবাদের টমসন-লিখিত ভূমিকায় শরৎচন্দ্রের আত্মস্বীকৃতি উল্লেখযোগ্য। শরৎচন্দ্র লিখেছেন-

> From my father I inherited nothing except, as I believe, his restless spirit and his keen interest in literature. The first made me a tramp and sent me out tramping the whole of India quite early, and the second made me a dreamer all my life. Father was a great scholar and he had tried his hand at stories and novels, dramas and poems, in short, every branch of literature, but never could finish anything. I have not his work now- somehow it got lost, but I remember pouring over those incomplete mss. Over and over again in my childhood, and many a night I kept awake regretting their incompleteness and thinking what might have been their conclusion, if finished. Probably this led to my writing short stories when I was barely seventeen. (অজিতকুমার, 2000 :12)

মতিলাল ভাগলপুরের এইচ.ই. স্কুলে এন্ট্রান্স ক্লাসে ভর্তি হয়েছিলেন। ১৮৭৩ খ্রিস্টাব্দে তিনি তৃতীয় বিভাগে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। অতঃপর তিনি পাটনা কলেজে কিছুদিন অধ্যয়ন করেছিলেন। কেদারনাথের ছোটোভাই অঘোরনাথ মতিলালের সমবয়সী ও সতীর্থ ছিলেন। তিনিও এই কলেজে পড়তেন। উভয়ই এক মেসে থাকা সত্ত্বেও মতের ভিন্নতার কারণে মতিলাল তাঁর সঙ্গে দূরত্ব রেখে চলতেন। মতিলালের খেয়ালি ও উদ্‌ভ্রান্ত জীবনে তাঁর সহধর্মিণী ভুবনমোহিনী দেবী ছিলেন নোঙরস্বরূপ। তাঁর চারিত্রিক মাধুর্য, স্নেহ-প্রেম-মমতার ডোর দিয়ে তিনি মতিলালকে সংসারে বেঁধে রেখেছিলেন। এ সম্পর্কে সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য–

> হয়তো মতিলাল দীর্ঘদিন টিকে থাকতে পারতেন না, যদি না ভুবনমোহিনীর মত সঙ্গিনী এবং সহধর্মিণী পেতেন। সরস কোমল হৃদয়ের অসীম মাধুর্যরসের উত্তপ্ত ভালোবাসার উর্বর ভূমির উপর তাঁর পতিভক্তি ... ছিল হিঁদুয়ানির আদর্শের নিগড়ে একান্ত দৃঢ়বিধৃত। তার মেদুর ছায়ার তলে এই যাযাবর মানুষটি গেড়েছিলেন তাঁর আসন। মতিলালের ছন্নছাড়া জীবনটিকে ভুবনমোহিনী আমরণ কেমন করে তাঁর প্রেমভক্তির অঞ্চলে আবদ্ধ রেখেছিলেন সে কথাও পরে আপনিই এসে পড়বে। (অজিতকুমার, ২০০০ :১২)

শরৎচন্দ্রের মা সুশ্রী ছিলেন না, কিন্তু তাঁর গুণে সকলেই মুগ্ধ ও মোহিত ছিল। তাঁর পাতিব্রত্য ছিল অসাধারণ ও অনন্য। স্বামীর প্রতি অবিচল প্রেম, শ্রদ্ধা ও ভালোবাসায় তিনি ছিলেন তুলনাহীনা। স্বামীর একান্ত বাধ্য ভুবনমোহিনীর মুখে স্বামীর প্রতি অভিমান বা অনুযোগের সুর কখনো ছিল না। সংসারের সকলের সেবা-যত্নে তিনি নিজেকে অকাতরে বিলিয়ে দিয়েছেন। নিজের দিকে ভ্রুক্ষেপ করার সময়ই তাঁর ছিল

না। তাঁর কর্মনিষ্ঠা ও কুশলতায় একান্নবর্তী বৃহৎ সংসারটি সুশৃঙ্খলভাবে চলত। নিজের গুণে ও চারিত্রিক মধুরতায় তিনি ছিলেন সকলের প্রিয়, সবার একমাত্র নির্ভরস্থল। তিনি প্রকৃতপক্ষেই ছিলেন ভুবনমোহিনী। ভুবনমোহিনী তাঁর উদাসীন ও ভাবপ্রবণ স্বামী ও দুরন্ত পুত্রকে সামাল দিতে কতখানি কষ্ট করেছেন তা একমাত্র তিনিই ভালো জানেন। তিনি শাসন-পীড়ন করে নয়, স্নেহ-প্রেমের বাঁধন দিয়েই তাদেরকে বেঁধে রেখেছিলেন। যেদিন সে বাঁধন ছিন্ন হলো, সেদিন পিতা-পুত্র দুজন দুদিকে ছিটকে পড়লেন। ভুবনমোহিনীর মৃত্যুতে মতিলাল তার সমস্ত জীবনের পরম শান্তি ও স্বস্তির আশ্রয় থেকে বিচ্যুত হয়ে দিকভ্রষ্ট হয়ে পড়লেন; শরৎচন্দ্রও মাকে হারিয়ে ছন্নছাড়া জীবনের পথে ধাবিত হলেন। কিন্তু মাকে তিনি কখনো বিস্মৃত হননি। এই স্নেহময়ী, কোমলহৃদয়া জননীর স্মৃতি তাঁর হৃদয়ের অন্তস্তলে অম্লান হয়ে রইলো। সাহিত্যচর্চার বিভিন্ন পর্যায়ে তিনি যেসব মাতৃচরিত্র সৃষ্টি করেছেন, সেগুলোতে তাঁর মায়ের স্মৃতি সংমিশ্রিত হয়ে চরিত্রগুলোকে করে তুলেছে সজীব, প্রাণময় ও বাস্তব।

মতিলাল ও ভুবনমোহিনীর জ্যেষ্ঠা কন্যা অনিলা দেবী। পিতা-মাতা জীবদ্দশায় অনিলাদেবীর বিয়ে দিয়েছিলেন হাওড়া জেলার গোবিন্দপুর গ্রামের পঞ্চানন মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে। এই দিদির নামে শরৎচন্দ্র তাঁর কয়েকখানা গ্রন্থ প্রকাশ করেন, সেজন্য এই ছদ্মনামটি শরৎ-সাহিত্যে স্মরণীয় হয়ে আছে। অনিলাদেবীর পরে ভুবনমোহিনীর একটি পুত্র সন্তান হয়ে মারা যায়। সে কারণে সংস্কারবশে তাঁকে দেবানন্দপুরে পাঠানো হয়। আর এই দেবানন্দপুরেই শরৎচন্দ্রের জন্ম হয়। শরৎচন্দ্রের পরে ভুবনমোহিনীর আরেকটি পুত্র সন্তান ভূমিষ্ট হয়েই মারা যায়। ভুবনমোহিনীর চতুর্থপুত্রসন্তান প্রভাসচন্দ্রের জন্ম শরৎচন্দ্রের প্রায় বার বৎসর পরে। পরবর্তী সময়ে প্রভাসচন্দ্র রামকৃষ্ণ মিশনের সন্ন্যাসগিরিতে যোগ দেন দেন; তখন তাঁর নাম হয় স্বামী বেদানন্দ। প্রভাসচন্দ্রের প্রায় আট বছর পরে জন্ম হয় শরৎচন্দ্রের কনিষ্ঠ ভ্রাতা প্রকাশচন্দ্রের। বার্মা থেকে ফিরে এসে শরৎচন্দ্র মুঙ্গেরের সুরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্যের মেয়ে কনকলতার সঙ্গে প্রকাশচন্দ্রের বিয়ে দেন। শরৎচন্দ্রের ছোট বোনের নাম ছিল সুশীলা ওরফে মুনিয়া। আসানশোলের কয়লা ব্যবসায়ী রামকিঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে শরৎচন্দ্র মুনিয়ার বিয়ে দিয়েছিলেন। এই হলো তাঁর পারিবারিক জীবনের পরিচয়।

শৈশব ও কৈশোর জীবন

হুগলির দেবানন্দপুরে শরৎচন্দ্রের শৈশব ও কৈশোরের মাত্র কয়েকটি বছর কেটেছিল। পিতা মতিলালের পরিবার ছিল দরিদ্র ও অসচ্ছল। মাতা ভুবনমোহিনীর পরিবার সেই তুলনায় ছিল অপেক্ষাকৃত সচ্ছল ও অভিজাত। তাছাড়া গুছানো সংসারজীবন মতিলালের ছিল না। ডিহরিতে দুবছরের চাকরিজীবন ছাড়া অন্য সময়ে

তিনি ছিলেন ভাগলপুরে শ্বশুরবাড়ির আশ্রয়ে। তাই শরৎচন্দ্রের শৈশব ও কৈশোর জীবন দুই এলাকাকে কেন্দ্র করেই কেটেছে। কৈশোরে শরৎচন্দ্র ছিলেন রোগা প্রকৃতির; স্বভাবে ছিলেন খুব চঞ্চল ও দুরন্ত, পা দুটি ছিল সরু এবং ক্ষিপ্রগতিসম্পন্ন। যেখানে ছিল নিয়মের কড়াকড়ি সেখানেই তাঁর সরব বিদ্রোহ ঘোষিত হতো। তাঁর দৌরাত্ম্যে গ্রামবাসী, পাঠশালার পণ্ডিতমশাই ও ছাত্ররা অতিষ্ঠ ছিল। দেবানন্দপুর থাকাকালে শরৎচন্দ্র পাঠশালায় এক-একদিন এক-এক কাণ্ড ঘটিয়ে আসত। ছেলের মানুষ হওয়া নিয়ে তাঁর মা ভুবনমোহিনী ছিলেন উদ্বিগ্ন ও বিচলিত। শরৎচন্দ্রের বাল্যকালে একবার তার মাথায় ফোঁড়া ও ঘা হয়। ফলে তাঁর মাথার অনেক চুল উঠে যায়। সে সময় পিতামহী তাকে আদর করে ন্যাড়া বলে ডাকতেন। সেই থেকে বন্ধুবান্ধব ও আত্মীয়-স্বজনের কাছে তিনি ন্যাড়া অথবা ল্যাড়া নামে পরিচিত হন। আবার এন্ট্রাস পরীক্ষায় পাশ করবার পর মায়ের কথায় তারকেশ্বরে গিয়ে মানত পালন উপলক্ষে তিনি ন্যাড়া হয়ে আসেন। এই নাম সম্বন্ধে উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় লিখেছেন–

> জন্মকালে বোধ হয় তার মাথায় চুল কম ছিল বলে ঐ নামে ডাকা হ'ত। কিন্তু দেবানন্দপুর থেকে ভাগলপুরে মামার বাড়ি আসার পর তার ন্যাড়া নাম খুব বেশি চলেনি। শরতের পিতা মতিদাদা আর মাতা আমাদের সেজদিদি শরৎকে ন্যাড়া বলে ডাকতেন; কিন্তু কখনো সখনো। কতকটা শখ করে এক-আধজন ছাড়া আর বড় কেউ ও-নামে ডাকত না।' এমনকি শেষাশেষি মতিদাদা এবং সেজদিদিও ন্যাড়া ও শরৎ দুই নামেই মিলিয়ে ডাকা আরম্ভ করেছিলেন, তা বেশ মনে পড়ে। কিন্তু কি জানি কেন, মতিদাদার মুখে শুনেই বোধ করি আদমপুর ক্লাবে শরতের ন্যাড়া নাম প্রায় ষোল আনা চলিত হয়ে গিয়েছিল। (অজিতকুমার, ২০০০ : ১৪)

তবে আদমপুর ক্লাবের সদস্যরা শরৎচন্দ্রকে ন্যাড়ার পরিবর্তে ল্যাড়া বলে ডাকত। এই ল্যাড়া শব্দটিকেই শরৎচন্দ্র ইউরোপীয় কায়দায় Lara-য় দাঁড় করিয়ে, নিজ নাম স্বাক্ষর করতেন St. C Lara. বাল্যকাল শরৎচন্দ্র কোথায় কতদিন কাটিয়েছিলেন এ নিয়ে তাঁর সমসাময়িক ও ঘনিষ্ঠ পরিজনদের মধ্যে মতবিরোধ দেখা যায়। এ সম্পর্কে সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় বলেছেন যে, শরৎচন্দ্র জন্মের দুই-তিন বৎসর পরেই ভাগলপুরে আসেন এবং নয় বৎসর সেখানে ছিলেন। ভাগলপুরেই তাঁর লেখাপড়ার হাতেখড়ি। তারপর তিনি দেবানন্দপুরে গিয়ে তিন বছর ছিলেন এবং সেখান থেকে প্রত্যাবর্তন করে রেঙ্গুন যাবার পূর্ব পর্যন্ত ভাগলপুরে ছিলেন। তাঁর বাল্য ও কৈশোর জীবন ভাগলপুর ও দেবানন্দপুরেই অতিবাহিত যায়। শরৎচন্দ্রের কৈশোর ও প্রথম যৌবনের সর্বাপেক্ষা অন্তরঙ্গ সঙ্গী ছিলেন রাজু ওরফে রাজেন্দ্রনাথ। আর রাজেন্দ্রনাথের প্রতিনিধিত্বকারী চরিত্র হলো *শ্রীকান্তের* ইন্দ্রনাথ। গঙ্গার তীর-ঘেঁষা স্থানটি যেখানে রাজুদের বাড়ি ছিল তার নাম আদমপুর, এটি ভাগলপুরে অবস্থিত। আর এই আদমপুর অঞ্চলের ধনকুবের শিবচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের পরিবারের সঙ্গে

শরৎচন্দ্রের মাতুলালয়ের ঘোর শত্রুতা ছিল। রাজু ও শরতের দল মিলে একটি সংগঠন গড়ে তোলে। শরৎচন্দ্র এই দলের পাণ্ডা এবং রাজা শিবচন্দ্রের একমাত্র পুত্র সতীশচন্দ্র ছিলেন এই ক্লাবের প্রাণ। আদমপুর পাড়ার নামানুয়ায়ী দলটির নাম হলো 'আদমপুর ক্লাব'। আর এই ক্লাবকে কেন্দ্র করেই কলেজে পড়ার সময় শরৎচন্দ্র সাহিত্যচর্চা, গানবাজনা ও অভিনয়ে মেতে ওঠেন। এটি ছিল তাঁর জীবনের সন্ধিসময়; কৈশোরের অন্ত ও যৌবনের প্রারম্ভিক পর্যায়। ১৮৯৫ খ্রিস্টাব্দের নভেম্বরে শরৎচন্দ্রের মাতা ভুবনমোহিনী দেবীর মৃত্যু হলে অর্থাভাবে তাঁর কলেজের পড়াশুনা বন্ধ হয়। এ-সময় মতিলাল ঋণের দায়ে দেবানন্দপুরের বসতবাড়ি বিক্রি করেন। তাই শরৎচন্দ্র পিতার সঙ্গে ভাগলপুরের খঞ্জরপুর পল্লিতে ভাড়া বাসায় বসবাস শুরু করেন। ফলে শরৎচন্দ্রের প্রাতিষ্ঠানিক পড়ালেখা এখানেই ইস্তফা দিতে হয়।

শিক্ষাজীবন ও অধ্যয়ন

শরৎচন্দ্রের শিক্ষার হাতেখড়ি কোথায় হয়েছিল তা নিয়ে আত্মীয়-পরিজনদের মধ্যে বিরোধ-বিতর্ক রয়েছে। তবে একথা বলা যায়, শরৎচন্দ্রের প্রাথমিক শিক্ষা দেবানন্দপুর ও ভাগলপুর দুজায়গায়ই হয়েছে। এ বিষয়ে সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের ভাষ্য থেকে জানা যায়, শরৎচন্দ্রের জন্মের দুই-তিন বছর পরেই ভুবনমোহিনী ভাগলপুরে চলে আসেন এবং নয় বছর পর্যন্ত এখানেই ছিলেন। ভাগলপুরেই তার পড়ালেখা শুরু হয়, অবশ্য মাঝখানে কিছুদিন তিনি দেবানন্দপুর গিয়ে বছর তিনেক ছিলেন এবং পুনরায় ভাগলপুরে ফিরে এসেছিলেন। কিন্তু এ প্রসঙ্গে দেবানন্দপুরের দ্বিজেন্দ্রনাথ দত্ত মুন্সীর উক্তি সম্পূর্ণ বিপরীত। তিনি লিখেছেন, শরৎচন্দ্রের প্রাথমিক শিক্ষালাভ হয়েছিল দেবানন্দপুরে। শরৎচন্দ্র কোন্ কোন্ বিদ্যালয়ে শিক্ষালাভ করেছেন তারও একটি বর্ণনা দিয়েছেন তিনি। তাঁর মতে, পাঁচ বছর বয়সে বাড়ির কাছে প্যারী পণ্ডিতের (বন্দ্যোপাধ্যায়) পাঠশালায় শরৎচন্দ্রের বিদ্যারম্ভ হয়। পরে সিদ্ধেশ্বর ভট্টাচার্য পরিচালিত গ্রামের নতুন বাংলা স্কুলে লেখাপড়া। তিনি আরও বলেছেন, মতিলাল বিহারের ডিহরিতে চাকরি পাবার পর সপরিবারে তিনি ডিহরিতে যান। তখন শরৎচন্দ্রের বয়স আট বছর। আর এই আট বছর বয়স পর্যন্ত শরৎচন্দ্র কোথায় কি পড়েছেন তা নিয়ে যথেষ্ট বিভ্রান্তি রয়ে গেছে। তবে এ প্রসঙ্গে সুরেন্দ্রনাথের মতকেই অধিকতর গ্রহণযোগ্য বলা যায়। তাঁর কথা মেনে বলতে হয়, শরৎচন্দ্র ২/৩ বছর বয়সে ভাগলপুরে গিয়েছিলেন; সেখানে প্রাথমিক শিক্ষারম্ভের পর ৫/৬ বছরে দেবানন্দপুর ফিরে আসেন। সেখানে প্যারিপণ্ডিত ও সিদ্ধেশ্বর ভট্টাচার্যের বিদ্যালয়ে পাঠগ্রহণ করার পর আট বছর বয়সে ডিহরিতে যান এবং দুবছর পরে ফিরে এসে ভাগলপুরে ছাত্রবৃত্তি ক্লাসে ভর্তি হন। অতঃপর পরবর্তী জীবনের শিক্ষাগ্রহণ সম্পর্কে আর কোনো মতান্তর নেই। দ্বিজেন্দ্রনাথ দত্ত মুন্সী শৈশবকালের শরৎচন্দ্র সম্পর্কে বলেছেন–

> বালক শরৎচন্দ্র ছিলেন চঞ্চল ও উদ্দাম প্রকৃতির; তাঁহার বিদ্যারম্ভ হয় তাঁহাদেরই বাটীর নিকটবর্তী প্যারী (বন্দ্যোপাধ্যায়) পণ্ডিত মহাশয়ের পাঠশালাতে; একটি প্রশস্ত চণ্ডীমণ্ডপে এই পাঠশালাটি বসিত এবং এখানে অনেকগুলি 'পড়ুয়া' ছাত্রছাত্রী ছিল; শরৎচন্দ্র ইহাদের মধ্যে ছিলেন সর্বাপেক্ষা দুরন্ত কিন্তু মেধাবী। পণ্ডিত মহাশয় শরৎচন্দ্রকে বিশেষ স্নেহের চক্ষে দেখিতেন ও অনেক সময়ই তাঁহার দুরন্তপনা নির্বিচারে সহ্য করিতেন। পাঠশালায় দুরন্তপনার জন্য তাঁহার পিতা তাঁহাকে গ্রামে নতুন স্থাপিত সিদ্ধেশ্বর ভট্টাচার্য মাস্টার মহাশয়ের বাঙলা স্কুলে ভর্তি করিয়া দেন ও এই স্কুলে প্রায় তিনি এক বৎসর কাল পড়েন।(অজিতকুমার, ২০০০ : ১৫)

পাঠশালায় পড়ার সময় একটি মেয়ের সঙ্গে শরৎচন্দ্রের ঘনিষ্ঠতা জন্মেছিল। মেয়েটির সঙ্গে সর্বদা খেলা করে বেড়াতেন তিনি। ছিপ দিয়ে মাছ ধরা, নৌকা নিয়ে নদীবক্ষে বেড়ানো, বৈঁচিফুল পেড়ে মালা গাঁথা, বাগান থেকে ফল চুরি করা, ঘুড়ির সুতায় মাঞ্জা দেওয়া, বনজঙ্গলে বেড়ানো ইত্যাদি কাজে মেয়েটি ছিল তাঁর সার্বক্ষণিক সহচর। ছেলেবেলায় শরৎচন্দ্র অতিমাত্রায় দুরন্ত ছিলেন। তাঁর দৌরাত্ম্যে গ্রামের জনগণ অতিষ্ঠ ছিল। মতিলাল ডিহরিতে কাজ পেলে তারা সেখানে চলে যায়। ডিহরিতে তাঁর চাকরি স্থায়ী হয়েছিল দুই বছর, ১৯৮৬ খ্রিস্টাব্দে তিনি ভাগলপুরে ফিরে আসেন। ডিহরিতে শরৎচন্দ্র দুই বছর অবস্থান করলেও এই জায়গাটির স্মৃতি তাঁর মনে গভীর দাগ কেটেছিল। দুবছর পর পিতা চাকুরিচ্যুত হলে ডিহরি থেকে ভাগলপুরে এসে শরৎচন্দ্র দুর্গাচরণ এম. ই. স্কুলে ছাত্রবৃত্তি ক্লাসে ভর্তি হন। শরৎচন্দ্র যে স্কুলটিতে ভর্তি হয়েছিলেন সেটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল রাজা শিবচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের পিতা দুর্গাচরণের নামে। এই স্কুলের হেডপণ্ডিত ছিলেন অম্বিকাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং অন্যান্য পণ্ডিত হলেন শিবচন্দ্রের শ্যালক কান্তি পণ্ডিত, অক্ষয় পণ্ডিত এবং হরিপণ্ডিত। ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষায় পাশ করে সর্ববিদ্যায় বিশারদ হয়ে শরৎচন্দ্র ইংরেজি স্কুলে যথেষ্ঠ কৃতিত্বের পরিচয় দেন। ফলে বছর শেষে ডাবল প্রমোশন পান তিনি। ১৮৮৬-১৮৮৯ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত শরৎচন্দ্র ভাগলপুরে ছিলেন। সেখানে তাঁর সতীর্থ ছিলেন শরৎচন্দ্রের নিকটসম্পর্কীয় মামা সুরেন্দ্রনাথের বড় ভাই মনীন্দ্রনাথ। বাড়িতে মামাদের সঙ্গে শরৎচন্দ্রের বিদ্যাচর্চা চলতো, যার প্রমাণ পাই আমরা শ্রীকান্ত উপন্যাসে। এই মামা-ভাগ্নেকে পড়াতেন অক্ষয় পণ্ডিত। তাঁর কঠোর শাসনে-পীড়নে দুজনেই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়। এরপর ১৮৮৯ খ্রিস্টাব্দে মতিলাল আবার দেবানন্দপুরে প্রত্যাবর্তন করেন, এখানে এসে শরৎচন্দ্র হুগলী ব্রাঞ্চ স্কুলে চতুর্থ শ্রেণিতে (সপ্তম শ্রেণি) ভর্তি হন। ১৮৯৩ খ্রিস্টাব্দে দ্বিতীয় শ্রেণি এবং ১৮৯৪ খ্রিস্টাব্দে প্রথম শ্রেণিতে উত্তীর্ণ হন শরৎচন্দ্র। এ স্কুলে পড়ার সময় তিনি দাবা খেলায়, গান গাওয়ায় ও বাঁশি বাদনে দক্ষতা অর্জন করেন। ১৮৯২ খ্রিস্টাব্দে হুগলী ব্রাঞ্চ স্কুলে 'সেকেন্ড' ক্লাসের (নবম শ্রেণি) ছাত্র থাকা অবস্থায় দাদামশায় কেদারনাথ মারা গেলে পিতার পরিবারের দারিদ্র্য-চরমে ওঠে। ফলে শরতের একবছর পড়াশুনা বন্ধ থাকে। এই সময়ে 'কাশীনাথ', 'ব্রহ্মদৈত্য', 'কাকবাসা' গল্প রচনার মধ্যদিয়ে শরৎচন্দ্রের সাহিত্য-

রচনার সূত্রপাত ঘটে। ১৮৯৩ খ্রিস্টাব্দে অভাবের তাড়নায় পুনরায় ভাগলপুরে প্রত্যাবর্তন করেন তিনি। এখানে এসেই দেখেন তাঁর বাল্যবন্ধুদের মধ্যে অনেকে প্রবেশিকা পাশ করে কলেজে পড়ছে। এসময় সাহিত্যিক, শিক্ষক পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়ের আগ্রহে তেজনারায়ণ জুবিলী স্কুলে 'ফাস্ট' ক্লাসে (দশম শ্রেণি) শরৎচন্দ্র ভর্তি হন। এবার পরীক্ষা দেবার জন্য উঠে পড়ে লাগলেন তিনি, এবং টেস্ট পরীক্ষায়ও উত্তীর্ণ হলেন। কিন্তু পরীক্ষার ফি জোগাড় নিয়ে দেখা দিলসমস্যা। ভুবনমোহিনী পিতৃহীন ভাই বিপ্রদাসকে বিষয়টি জানালেন। বিপ্রদাস স্বল্পবেতনের সরকারি চাকুরে, বড় পরিবার চালানোর সামর্থ্য তাঁর ছিল না। মতিলাল সম্পূর্ণভাবে অক্ষম। তাই খঞ্জরপুরের কুসিদজীবী গুলজারিলালের কাছে চড়া সুদে টাকা ধার করে ভাগ্নের পরীক্ষার ব্যবস্থা করে দেন বিপ্রদাস। এত কষ্টের টাকা সার্থক হলো। ১৮৯৪ খ্রিস্টাব্দে শরৎচন্দ্র প্রবেশিকা (এন্ট্রান্স) পরীক্ষায় দ্বিতীয় বিভাগে উত্তীর্ণ হন। পরীক্ষায় পাশ করা বিষয়ে তারকনাথের মন্দিরে মানত রক্ষা করতে শরৎচন্দ্রের মস্তক মুণ্ডনের প্রয়োজন হয়েছিল। সে সময় থেকে বন্ধু-বান্ধবদের অনেকে তাকে ল্যাড়া/ন্যাড়া বলে ডাকত। পরবর্তীকালে তেজনারায়ণ জুবিলী কলেজে এফ. এ ক্লাসে ভর্তি হন তিনি। এই কলেজে শরৎচন্দ্রের মেধার প্রাখর্য ও ভাল ফলাফল দেখে বিজ্ঞানের এক শিক্ষক বিস্মিত হলেন। এ-পর্যায়ে ভাগলপুরে হাতে লেখা শিশু পত্রিকায় তাঁর 'কাশীনাথ' ও 'কাকবাসা' নামে দুটি গল্প প্রকাশিত হয়। কিন্তু দুভাগ্যবশত তিনি এফ.এ. পরীক্ষা দিতে পারেননি। এর কারণ ছিল পরীক্ষার ফি সংগ্রহে ব্যর্থতা, দ্বিতীয় কারণ ১৮৯৫ খ্রিস্টাব্দে নভেম্বরে মায়ের মৃত্যু। ১৮৯৬ খ্রিস্টাব্দে অর্থাভাবে কলেজের পড়াশুনা পুরোপুরিই বন্ধ হয়ে যায়। তার এই মনঃকষ্টের কথা পরবর্তী জীবনে তিনি বহুবার স্মরণ করেছেন। ১৯১৯ খ্রিস্টাব্দে ২৪ আগস্ট তিনি লীলরাণী গঙ্গোপাধ্যায়কে একখানি পত্রে লিখেছিলেন –

> বড় দরিদ্র ছিলাম ২০টি টাকার জন্য এগ্‌জামিন দিতে পাইনি। এমন দিন গেছে যখন ভগবানকে জানাতাম, হে ভগবান আমার কিছু দিনের জন্য জ্বর করে দাও, তাহলে দু'বেলা খাবার ভাবনা ভাবতে হবে না, উপবাস করেই দিন কাটাব। (সুরেন্দ্রনাথ, ১৩৩৫ : ৭২)

অবশ্য টাকার জন্য পরীক্ষা দিতে পারেনি শরৎচন্দ্র – এ বিষয় নিয়েও মতভেদ আছে। শরৎচন্দ্রের সঙ্গে খুব অন্তরঙ্গ সম্পর্ক ছিল মামা সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের। তাই গোপলচন্দ্র রায়ের কাছে তাঁর দেয়া উক্তিই অধিকতর গ্রহণযোগ্য বলে মনে হয়। তাঁর মতে, অর্থাভাবের কথাটাই সত্য। তবে টেস্ট পরীক্ষার সময় একটা গণ্ডগোল অবশ্য হয়েছিল। ভুবনমোহিনীর মৃত্যুর পর মতিলালের পক্ষে আর শ্বশুরবাড়ি থাকা সম্ভব হয়নি। তিনি ছেলেপুলে নিয়ে গাঙ্গুলী বাড়ি ছেড়ে খঞ্জরপুরে একটি ভাড়া বাড়িতে বসবাস শুরু করেন। কিন্তু নিদারুণ অর্থকষ্টে পড়ে মতিলালকে অনেকটা বাধ্য হয়েই ১৮৯৬ খ্রিস্টাব্দের ৯ নভেম্বর দেবানন্দপুরের বসতবাড়িটি বিক্রি করে দিতে

হয়। ফলে শরৎচন্দ্রের প্রাতিষ্ঠানিক পড়ালেখা এখানেই ইস্তফা দিতে হয়। শুরুরদিকে সাংসারিক অভাব-অনটন বিষয়ে শরৎচন্দ্র একেবারে নির্বিকার ছিলেন। পড়ালেখা ছাড়ার পর কিছুদিনের জন্য বনেলী এস্টেটে সামান্য বেতনে একটি চাকুরিতে নিযুক্ত হন। আর এখানেই নিরুপমা দেবী (১৮৮৩-১৯৫১) ও তাঁর ভাই বিভূতিভূষণ ভট্টের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা হয় শরৎচন্দ্রের ।

কর্মজীবন

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় পড়ালেখা ছাড়ার পর ১৯০০ খ্রিস্টাব্দে কিছুদিনের জন্য বিহারের গোড্ডায় রাজ বনেলী এস্টেটে সামান্য বেতনে একটি চাকুরিতে নিযুক্ত হন। অল্পকাল ব্যবধানে চাকুরি ছেড়ে কিছুদিন সাঁওতাল পরগনায় সেটেলমেন্টের কাজে যোগ দেন তিনি। পিতার মৃত্যুর পর ১৯০২ সালে ভাগ্যান্বেষণে কলকাতায় এসে উপেন্দ্রনাথের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা, সম্পর্কীয় মামা লালমোহনের অধীনে ত্রিশ টাকা বেতনে একটি কাজ পেলেন শরৎচন্দ্র। লালমোহন হাইকোর্টে যেসব মামলা পেতেন, সেগুলির হিন্দি থেকে ইংরেজিতে অনুবাদ করাই ছিল শরৎচন্দ্রের কাজ। লালমোহনের ভগ্নিপতি অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায় ছিলেন রেঙ্গুনের অ্যাডভোকেট। তিনি একদা কলকাতায় লালমোহনের বাড়িতে বেড়াতে এলে এখানেই শরৎচন্দ্রের সঙ্গে অঘোরনাথের পরিচয় ও ঘনিষ্ঠতা হয়। অঘোরনাথ অসামান্য দেহশক্তির অধিকারী হলেও বেশ অমায়িক ও সদালাপী ছিলেন। ব্রহ্মদেশের নানা রোমাঞ্চকর গল্প তিনি শরৎচন্দ্রকে শোনাতেন। তাঁর কাছে গল্প শুনে শরৎচন্দ্র স্থির করলেন, তিনিও ব্রহ্মদেশে গিয়ে ওকালতি করবেন। সুরেন্দ্রনাথ লিখেছেন যে, ইতঃপূর্বেও শরৎচন্দ্রকে ব্রহ্মদেশে পাঠাবার জন্য মতিলালকে অঘোরনাথ ভাগলপুরে থাকার সময় অনুরোধ করেছিলেন। অঘোরনাথের কথা শুনে শরৎচন্দ্র বার্মায় যাওয়া স্থির করলেন। কারণ এছাড়া তাঁর অন্য কোনো উপায় ছিল না। পিতার মৃত্যুর পর তিনি যে আর্থিক কষ্ট ও ভয়াবহ সংকটের মধ্যে পড়েছিলেন, তা থেকে উদ্ধার পেতে দূরে পালিয়ে যাওয়া ছাড়া তাঁর গত্যন্তর ছিল না। তাই ১৯০৩ খ্রিস্টাব্দে তিনি কর্মোপলক্ষে বার্মার উদ্দেশ্যে পাড়ি জমান। ১৯০৫ খ্রিস্টাব্দে সেখানে রেলওয়ের অডিট বিভাগের চাকুরিতে যোগ দেন তিনি। অতঃপর যোগ দেন P.W.D-তে। আড়াই মাস পরে চাকুরিচ্যুত হলে ন্যায়ঙ্গলাবিনে ধানের ব্যবসা দেখাশুনার কাজ করেন। ১৯০৬ খ্রিস্টাব্দে একমাস ধানের ব্যবসা দেখাশুনা করে রেঙ্গুনে এসে পুনরায় P.W.D-র চাকুরি নেন। কিন্তু বার্মায় গিয়েও তিনি স্বস্তিতে ছিলেন না। বিভিন্ন সময়ের চিঠি-পত্র থেকে রেঙ্গুনে তাঁর চাকরি জীবনের পরিচয় পাওয়া যায়। প্রমথনাথ ভট্টাচার্যকে এ প্রসঙ্গে শরৎচন্দ্র লিখেছেন-

> অপমান সহ্য করে যে চাকরি করে সে করে, আমি তো কিছুতেই পারব না। ...এতদিন চাকরি কচ্চি ভাই, এমন ভয়ানক দুর্দশায় কখনো পড়িনি। ...এ শালার অফিস রাস্তার কুলিগিরির অধম। (গোপালচন্দ্র, ১৩৬৯ : ৪২)

চাকরি জীবনে শরৎচন্দ্র আত্মগ্লানিতে জ্বলেছেন। আত্মমর্যাদাবোধ এবং চাকরি একসঙ্গে রক্ষা করা তাঁর পক্ষে প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়ে। অন্নচিন্তা মানুষের পায়ে যে দাসত্বের শৃঙ্খল পরিয়ে দেয়, তার দৃষ্টান্ত স্বয়ং শরৎচন্দ্র। চাকরিস্থলে যে অসম্মানের বোঝা ঘাড়ে নিয়ে তাঁকে দিনযাপন করতে হয়েছে তা তিনি ব্যক্ত করেছেন ১৯১৩ সালের ৩১ মে প্রথমনাথ ভট্টাচার্যকে লেখা চিঠিতে। চিঠির মধ্যে সমস্ত যন্ত্রণা ঢেলে দিয়ে তিনি যেন বন্ধুর কাছে সান্ত্বনা চেয়েছেন। শরৎচন্দ্র নামক মুক্তবিহঙ্গের তীরবিদ্ধ ছবি এর চেয়ে স্পষ্টভাবে আর কোথাও পাওয়া যায়নি–

> আমাদের বড় সাহেব 'নিউমার্চ'। 'গোরা'তে রবিবাবু বলিয়াছেন,'আমি মাধব চাটুজ্যে নীলকরের গোমস্তা।' এর বেশি আর বলার আবশ্যক নাই। নিউমার্চ ঠিক তাই। ইনি এক বৎসর আসিয়া ৩৭ জন কেরানীকে 'রিডিউস' করিয়াছেন। অপরাধ, একজনের চিঠি 'ডেসপ্যাচ' করতে ৩ দিন দেরী হয়–আর একজনের একখানা ১৫ দিনের পুরানো চিঠি বার হয়, এই রকম। এর দৌরাত্ম্যে ডেপুটি অ্যাকাউন্টেন্ট জেনারেল চ্যান্টার সাহেব, ডেপুটি অ্যাকাউটেন্ট জেনারেল শ্রীনিবাস আইয়ার, অ্যাসিস্ট্যান্ট অ্যাকাউন্টেন্ট জেনারেল সুন্দরম, অ্যাসিস্ট্যান্ট অ্যাকাউন্টেন্ট জেনারেল ম্যাসেট, ১ মাসের মধ্যে 'মেডিকেল সার্টিফিকেট' দিয়ে পালাতে বাধ্য হয়। আমাদের প্রত্যেকের কাজ প্রায় দ্বিগুণ করে, আমাদের 'পি-ডব্লিউ-ডি' লোকেদের নিজেদের অফিসে নিয়ে গেছে। আমাদের অফিস আওয়ার 'স্ট্রিক্টলি উইথ হার্ডেস্ট লেবার ফ্রম ১০.৩০ টু ৬.৩০।' নিয়ম এই যে, যদি কারু কোনোদিন কোনো তরফ থেকে 'রিমাইন্ডার' আসে ৬-মাসের জন্য ১০ টাকা হিসাবে (জরিমানা) 'রিডাকশন'। এই তো সুখের চাকরি। তার উপর সেদিন 'লোকাল গভর্নমেন্ট'কে এই বলে [নিউমার্চ] মুভ করেছেন যে, অফিসের কেরানী ঘুষ দিয়ে মেডিকেল সার্টিফিকেট দিয়ে পালায়, তাতে অফিসের অত্যন্ত ক্ষতি হয়। সেইজন্য অফিসের চিঠি না গেলে সিভিল সার্জন কাউকে যেন মেডিকেল সার্টিফিকেট না দেন। আমাদের এখন মেডিকেল সার্টিফিকেট দেবার পথও বন্ধ হয়েছে। মেডিকেল সার্টিফিকেট দিলেও [নিউমার্চ] বলে, ওর 'সার্ভিস বুকে' নোট করে রাখ, মিথ্যা মেডিকেল সার্টিফিকেট। বর্মা বলেই এত জুলুম চলে যাচ্ছে। ..."দিন ৩/৪ পূর্বের ঘটনা বলি। হঠাৎ আমার একটা 'রিমাইন্ডার' আসে। এত কাজ যে ছোটখাট কাজ আমি দেখতেই পারি না – এটি আমার 'সাব অডিটর' ভৌমিকবাবু ও পেরিয়া স্বামীর দোষ, অবশ্য আমিই সমস্ত দোষ নিলাম। 'একস্‌প্লেনেশন' দিলাম আমারই 'ওভারসাইট'। ইত্যবসরে 'রেজিগ্‌নেশন' লিখে রাখলাম। ঠিক জানি ১০ টাকা গেছেই। কি জানি নিউমার্চ দয়া করে কোনো কথাই বললেন না। দুর্ভাগ্য কি সৌভাগ্য জানিনা, আমার আর 'রেজিগ্‌নেশন' দেওয়া হলো না। কিন্তু শরীর আমার আর বয় না। লেখা-টেকাও প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়েছে। ...এও বুঝতে পাচ্ছি, এই সাহেব (ডালকুত্তা) যদি না যায়, শীঘ্র যাবার বড় আশাও দেখিনে–তাহলে আমাকে অন্তত ছাড়তেই হবে। শালা অন্য অফিসে 'অ্যাপ্লিকেশন' পর্যন্ত 'ফরওয়ার্ড' করে না। ঢের পাজি লোক দেখেছি, কিন্তু এমনটি শোনাও যায় না। (গোপালচন্দ্র, ১৩৬৯ : ৪৬)

শরৎচন্দ্রের দীর্ঘ চিঠি থেকে এটা পরিষ্কার, নিউমার্চের কড়া শাসনে একজামিনার পাবলিক ওয়র্কস অ্যাকাউন্টেন্ট অফিসের উচ্চ এবং নিম্নপদস্থ কর্মীবৃন্দ 'ত্রাহি মধুসূদন' জপ করেছেন। অন্যসূত্রে জানা যায়, নিউমার্চ আসার আগে এই অফিসের শাসন অনেক শিথিল ছিল। যোগেন্দ্রনাথ সরকারের সঙ্গে শরৎচন্দ্র দীর্ঘদিন অফিসের টিফিনের সময় মশগুল হয়ে সাধারণ সাহিত্য বা নিজের সাহিত্যকর্ম নিয়ে আলোচনা করেছেন। স্বভাবতই সেই আলোচনা টিফিনের নির্ধারিত সময় অতিক্রম করে অধিকার করে নিত অফিসের কাজের সময়। কর্তৃপক্ষ তা ক্ষমার চোখে দেখতেন। এক্ষেত্রে নিউমার্চের আগমন কর্মীবৃন্দের ঢিলেঢালা কর্মজীবনে যথেষ্ট উৎপাতের সৃষ্টি করেছিল। চাকরি জীবনের এহেন তিক্ত অভিজ্ঞতার পরেও শরৎচন্দ্র পুনরায় চাকরির বৃত্তে জড়িয়ে পড়তে চেয়েছেন। তবে তা বার্মায় নয়, বাংলাদেশে। শরৎচন্দ্র বিশেষ খুশি হয়েছিলেন বন্ধু প্রমথনাথ ভট্টাচার্য কলকাতায় তাঁর চাকরির চেষ্টা করায় –

> কলকাতায় আমার চাকরির চেষ্টা কচ্চ শুনে খুশি হলাম। ...কোথাও একটা ৪০/৫০ টাকার চাকরি যোগাড় করে দিতে পারো তো যাই। যা হোক একটা চাকরি কলকাতায় দাও, আমি রিজাইন দিয়ে চলে যাই। না, চাকুরিপ্রীতি নয়, সাহিত্যসৃষ্টির জন্য প্রয়োজনীয় আর্থিক নিরাপত্তা, উপযুক্ত পরিবেশ, সহৃদয় (সহৃদয়-হৃদয়-সংবাদী) রসিকগোষ্ঠী, রচনা প্রকাশবাহন যোগ্য পত্রিকা–রেঙ্গুনে এসব ছিল না। তখনো পর্যন্ত সাহিত্য লিখে গ্রাসাচ্ছাদন করা যায় এই প্রত্যয় তার আসেনি। ["সাহিত্যচর্চা করে পেট ভরে না ভাই"] (গোপালচন্দ্র, ১৩৬৯ : ৪৬)

আর্থিক কারণে চাকরি চেয়েছেন এবং সে ক্ষেত্রে পত্রিকার সাব-এডিটারিকে তিনি প্রাধান্য দিয়েছেন। প্রমথনাথকে আশ্বস্ত করে তিনি বলেছেন,'পাঠক পত্রিকা পড়ে 'ছি-ছি' করবে, এমন কাগজ কোনো মাসেই হতে দেবেন না। নিজ কর্মগুণের তালিকা একই সঙ্গে তিনি পেশ করেছেন একটা বড় গল্প, একটা ধারাবাহিক ভাল উপন্যাস, একটা প্রবন্ধ, একটা সমালোচনা যেমন তিনি লিখবেন, তেমনি ছবি 'জাজ' করা, গানের স্বরলিপির দোষগুণ ধরা, বৈজ্ঞানিক আলোচনা, সাহিত্যিক আলোচনাও করবেন। সকাল দশটা থেকে বিকাল পাঁচটা পর্যন্ত এসব কাজ তিনি স্বাচ্ছন্দ্যে করতে পারবেন। শরৎচন্দ্রের ক্রমাগত শারীরিক অসুস্থতাও কলকাতায় আসার বড়ো কারণ ছিল। কিন্তু গিরীন্দ্রনাথ সরকার লিখেছেন –

> অ্যাকাউন্টেন্ট জেনারেল অফিসের ছোট সাহেবের সহিত সামান্য কারণে ঘুষাঘুষি করিয়া তিনি ১৯১৬ খ্রিস্টাব্দে চাকুরিতে ইস্তফা দিয়া কলিকাতায় চলিয়া আসেন। (গিরীন্দ্রনাথ, ১৯৩৯ : ৩২০)

এরকম বর্ণনা যোগেন্দ্রনাথ সরকারের লেখায়ও পাওয়া যায়। গোপালচন্দ্র রায় ঐ কারণটির পক্ষে একাধিক সূত্র উদ্ধার করেছেন। শরৎচন্দ্র স্বয়ং একটি চিঠিতে লিখেছেন, বর্মার রেঙ্গুনে ছিলাম কেরানি, হঠাৎ বড়সাহেবের সঙ্গে মারামারি করে

চাকরি ছেড়ে দিয়ে এই [সাহিত্য] ব্যবসা আরম্ভ করেছি।' ব্যাপারটি বিস্ময়কর মনে হয়। কাজেই নিছক ইস্তফা দেওয়া নয় একেবারে ঘুষোঘুষি করে ইস্তফা? এ প্রসঙ্গে অবশ্য যোগেন্দ্রনাথ সরকার বলছেন, বার্মায় বসবাসের শেষ পর্বে শরৎচন্দ্র লেখক হিসেবে বাংলাদেশে খ্যাতি অর্জন করতে শুরু করেন; সেইসঙ্গে অর্থাগমেরও শুরু। এতদিন তিনি দারিদ্র্যের সঙ্গে তীব্র লড়াই করে এসেছেন, সেই জীবনে যেন নতুন স্বাদ এনে দিল তাঁর রচনা। বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে তিনি তখন কার্যত সম্পর্ক চুকিয়ে অফিসের বাইরে অন্য সময় লেখায় নিমগ্ন থেকেছেন। ধীরে ধীরে তাঁর অন্তর্গহনে তৈরি হচ্ছে স্বাধীন লেখকসত্তা। ফলে কোনো বাঁধাধরার মধ্যে থাকতে একান্ত অনিচ্ছুক শরৎচন্দ্র। প্রকাশক গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়ও তাঁকে তখন নানাভাবে উৎসাহিত করেছেন বার্মা ত্যাগে। এসব কারণে শরৎচন্দ্রের স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া,'আমার আর এখানকার চাকরি একদিনও ভালো লাগছেনা।' সেই অনিচ্ছা নামক বারুদস্তূপে অগ্নিসংযোগ করেছে কোনো একদিনের ঘটনা, যা হয়তো আপাত তুচ্ছ, কিন্তু শরৎচন্দ্রের বেপরোয়া সত্তা এ সুযোগে পায়ে জড়ানো চাকরি-শিকল ছিঁড়ে ফেলে তরণী ভাসিয়েছে কলকাতার উদ্দেশ্যে। আর নতুন চাকরি নয়, সাহিত্য বিধাতার আদেশ শিরোধার্য করে সর্বদ্বিধামুক্ত শরৎচন্দ্র তখন পুরোপুরি সাহিত্যিক হওয়ার সাধনায় সুস্থির। ১৯০৩ থেকে ১৯১৬ সাল পর্যন্ত তিনি বার্মায় চাকরিজীবনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। ১৯১৬ খ্রিস্টাব্দে শরৎচন্দ্র পা ফোলা রোগে আক্রান্ত হন, তখন ছুটির আবেদন অগ্রাহ্য হলে চাকুরি ছেড়ে কলকাতা প্রত্যাবর্তন করেন।

সাহিত্যজীবন

১৮৯৩ সালে মাত্র ১৭ বছর বয়স থেকে শরৎচন্দ্রের সাহিত্য লেখায় হাতেখড়ি। ঐ বছর তিনি 'কাশীনাথ' ও 'কাকবাসা' গল্প দুটি রচনা করেছিলেন এবং 'কোরেল গ্রাম' (পরিবর্তিত নাম *ছবি*) গল্পটির রচনা শুরু করেন। ১৮৯৭ সালে খঞ্জরপুরে বিভূতিভূষণ ভট্টের বাড়িতে মাতুল সুরেন্দ্রনাথ, গিরীন্দ্রনাথ ও উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের সঙ্গে সাহিত্যচর্চার আসরে যোগ দেন। ১৮৯৮ সালে মিসেস হেনরি উডের 'ঈস্টলিনে'র ভাবাবলম্বনে *অভিমান* উপন্যাস রচনা করেন। ১৮৯৯ সালে 'বোঝা', 'অনুপমার প্রেম', 'সুকুমারের বাল্যকথা' ও 'বাগান' রচনা করেন। মেরি করেলির *মাইটি এটম* অবলম্বনে *পাষাণ* উপন্যাসও শরৎচন্দ্রের এ-সময়ের রচনা। ১৯০১ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে শরৎচন্দ্রের *বড়দিদি*, *শুভদা*, *চন্দ্রনাথ* ও *দেবদাস* প্রভৃতি উপন্যাস রচিত হয়। ১৯০২ সালে অনুরূপা দেবীর স্বামী উকিল শিখরনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে শরৎচন্দ্রের পরিচয়। জমিদার মহাদেব সাহুর বাড়িতে গায়ক ও বাদকের দায়িত্ব লাভ এবং এ সময়েই পিতা মতিলাল চট্টোপাধ্যায়ের মৃত্যু হয়। ১৯০৩ সালে মামা গিরীন্দ্রনাথের অনুরোধে আরেক মামা সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের নামে কুন্তলীন গল্প প্রতিযোগিতায় '*মন্দির*' গল্প প্রেরণ করেন তিনি। *বসুমতি* সম্পাদক শ্রী জলধর সেন কর্তৃক দেড়শ গল্পের মধ্যে 'মন্দির'শ্রেষ্ঠ বিবেচিত হয়। গল্পটি ভাদ্র ১৩১০ সালে কুন্তলীন পুরস্কার

১৩০৯ সালে পুস্তকে সুরেন্দ্রনাথের নামে প্রকাশিত হয়। 'মন্দির'ই শরৎচন্দ্রের প্রথম মুদ্রিত রচনা। 'কুন্তলীন' পুরস্কার পাওয়া তাঁর বেনামি গল্প 'মন্দিরে'র রচনাকাল ১৯০৩ খ্রিস্টাব্দে এবং সে-বছরই তিনি বার্মায় চলে যান। এখানেই শরৎচন্দ্রের সাহিত্যজীবনের প্রথম পর্বের সমাপ্তি ঘটে। *ভারতী* পত্রিকায় ১৯০৭ খ্রিস্টাব্দে *বড়দিদি* প্রকাশিত হলে শরৎচন্দ্র সহসাই বিপুল খ্যাতি অর্জন করেন। সে সময় তিনি ছিলেন বার্মায়। তিনি সেখানে থাকতেই *যমুনা* পত্রিকায় (১৩১৯) 'বোঝা' গল্পটি এবং সুরেশচন্দ্র সমাজপতি সম্পাদিত *সাহিত্য* পত্রিকায় (১৩১৯) 'বাল্যস্মৃতি' ও 'কাশীনাথ' নামক গল্প দুটি মুদ্রিত হয়। এ-সব গল্প শরৎচন্দ্রের প্রথম দিকের রচনা এবং তাঁর বার্মা যাওয়ার পূর্বে ১৯০১ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে রচিত। ১৯০৯ খ্রিস্টাব্দে শরৎচন্দ্র বার্নার্ড ফ্রি লাইব্রেরি থেকে বই নিয়ে বিভিন্ন বিষয়ে প্রচুর পড়াশুনা করেন। এ-সময় হৃদরোগের লক্ষণ দেখা দেওয়ায় পড়াশুনা কমিয়ে ছবি আঁকা শুরু করেন। তাঁর প্রথম ছবি রাবণ–মন্দোদরী। ১৯১২ সালের ফেব্রুয়ারিতে ল্যান্সডাউন স্ট্রিস্টে শরৎচন্দ্রের বাড়িতে অগ্নিকাণ্ডের ফলে বাড়ির অন্যান্য জিনিসপত্রের সঙ্গে *চরিত্রহীন*-এর পাণ্ডুলিপি এবং আঁকা ছবি ভস্মীভূত হয়। এরই মধ্যে *যমুনা*-র সম্পাদক ফণীন্দ্রনাথ পালের সঙ্গে শরৎচন্দ্রের পরিচয় এবং নিয়মিত লেখার প্রতিশ্রুতি দেন। ১৯১৩ সাল থেকে যমুনা পত্রিকায় নিয়মিত লেখা শুরু। এ পর্যায়ে প্রকাশিত হয় *কাশীনাথ*। এ-সময় শরৎচন্দ্রের প্রকাশিত গ্রন্থ হচ্ছে *বড়দিদি* (উপন্যাস)। *বড়দিদি* ধারাবাহিকভাবে *ভারতী* পত্রিকায় (বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ় ১৩১৪ বঙ্গাব্দ) প্রকাশিত। ১৯১৪ সালের শেষের দিকে *যমুনা*-র সাথে শরৎচন্দ্র সম্পর্ক ছিন্ন করেন। এ-সময় শরৎচন্দ্রের অন্যান্য প্রকাশিত গ্রন্থসমূহ হচ্ছে *বিরাজ বৌ*, *পণ্ডিত মশাই* ও *পরিণীতা* উপন্যাস। ১৯১৫ সাল থেকে শরৎচন্দ্র *ভারতবর্ষে* নিয়মিত লিখতে থাকেন। এ-কালখণ্ডে প্রকাশিত গ্রন্থসমূহ *মেজদিদি*, *পল্লী-সমাজ*, *চন্দ্রনাথ*, *বৈকুণ্ঠের উইল* এবং *অরক্ষণীয়া*। *শ্রীকান্ত* (১ম পর্ব), *চরিত্রহীন* উপন্যাস এবং 'কাশীনাথ' গল্প এ-সময়ে প্রকাশিত হয়। বিশ শতকের প্রথম দুই দশকের বেশির ভাগ সময় তিনি বাংলার বাইরে সুদূর বার্মায় কাটিয়েছেন। এই তথ্য পর্যালোচনাসূত্রে থেকে শরৎচন্দ্রের মানসগঠনের একটা দিক সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। এ বিষয়ে গোপিকানাথ রায় চৌধুরীর মন্তব্য গুরুত্ববহ –

> একথা স্বীকার করতে হবে যে এই বাস্তব জীবনবাদী ঔপন্যাসিকের বাঙালী সমাজ ও জীবনগত অভিজ্ঞতার একটা বড় অংশই উনিশ শতক থেকে সংগৃহীত। ব্রহ্মদেশে যেসব গল্প উপন্যাস তিনি লিখেছেন, তার মধ্যে বাঙালি সমাজ পরিবেশের যে ছবি এঁকেছেন তার প্রায় সবটাই সেই উনিশ শতকের শেষ পর্যায়ের বাঙালি গ্রামীণ জীবনের বাস্তব অভিজ্ঞতার স্মৃতি থেকে আহরণ করা। (গোপিকানাথ, ২০০০ : ১৩৭)

শরৎচন্দ্রের মানসগঠনেও রয়েছে এই উনিশ শতকী প্রভাব। বিশেষ করে রেনেসাঁসের চিন্তাধারা তাঁকে মানবতাবাদী নতুন জীবনদৃষ্টি দান করেছিল। তাঁর অসংখ্য চরিত্র

সৃষ্টিতে ও কাহিনি সংগঠনে যেমন উনিশ শতকের বাংলার সমাজজীবনের রূপ ফুটে উঠেছে, তেমনি তাঁর চিন্তাধারায় তৎকালীন বাংলাদেশের প্রগতিশীল অংশের মানসরূপ প্রতিফলিত হয়েছে। *রামের সুমতি*, *পল্লী-সমাজ*, *চরিত্রহীন*, *শ্রীকান্ত* (১ম ও ২য় পর্ব) এবং *গৃহদাহ* (আংশিক) বার্মাজীবনে রচিত। এ সময় তিনি বাংলাদেশের প্রত্যক্ষ সংস্পর্শ থেকে দূরে ছিলেন। কিন্তু বাংলাদেশের প্রগতিশীল চিন্তাধারার সঙ্গে তাঁর যোগসূত্র একেবারে ছিন্ন হয়নি। পত্র-পত্রিকা এবং নতুন প্রকাশিত গ্রন্থের খোঁজ-খবর তিনি রাখতেন, বন্ধু-বান্ধবদের সাহায্যে সে সব আনিয়ে তিনি পড়তেন। এ-সময় রবীন্দ্রনাথের *চোখের বালি* ও *নষ্টনীড়* প্রকাশিত হয়। এই দুটি গল্প শরৎচন্দ্রের হৃদয়কে প্রচণ্ড আলোড়িত করে। নর-নারীর জীবনকে সমাজের দৃষ্টিকোণ থেকে না দেখে ব্যক্তিক দৃষ্টিকোণ থেকে দেখারএই প্রথম বলিষ্ঠ প্রয়াস শরৎচন্দ্রের উপর গভীর প্রভাব বিস্তার করে। *চরিত্রহীনে* এই প্রভাব যে অনেকখানি তা যে-কোনো সতর্ক পাঠকের চোখে ধরা পড়ে। বার্মাজীবনে রচিত উক্ত উপন্যাসগুলো নিয়ে শরৎচন্দ্রের সাহিত্যজীবনের দ্বিতীয় পর্বের উন্মেষ। এর সঙ্গে বিবেচনায় রাখতে হবে ১৯২০সাল পর্যন্ত প্রকাশিত অন্যান্য গল্প-উপন্যাসগুলোকে। এরপর থেকে শরৎচন্দ্রের লেখায় যুদ্ধোত্তর চিন্তাধারার প্রভাব লক্ষণীয়। এখান থেকে শুরু করে ১৯৩৮ সাল অর্থাৎ মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত তাঁর সাহিত্যজীবনের তৃতীয় পর্ব।

শরৎচন্দ্র ১৯১৬ সালে রেঙ্গুন থেকে স্থায়ীভাবে ফিরে এসে মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত যে-সকল সাহিত্য সৃষ্টি ও প্রকাশ করেন সেগুলো হচ্ছে যথাক্রমে *দত্তা*, *শ্রীকান্ত* (২য় পর্ব), *গৃহদাহ*, *বামুনের মেয়ে*, *দেনা-পাওনা*, *চন্দ্রনাথ*, *নব-বিধান*, *শ্রীকান্ত* (৩য় পর্ব), *পথের দাবী*, *শেষ প্রশ্ন*, *শ্রীকান্ত* (৪র্থ পর্ব) ও *বিপ্রদাস*প্রভৃতি উপন্যাস।'নারীর মূল্য', 'তরুণের বিদ্রোহ', 'স্বদেশ ও সাহিত্য' ইত্যাদি প্রবন্ধ এবং 'স্বামী' ও 'একাদশী বৈরাগী' গল্পও এ পর্যায়ের রচনা। সাহিত্য অবদানের জন্য কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে ১৯২৩ সালে 'জগত্তারিণী সুবর্ণ পদক' প্রদান করে। ১৯২৪ সালের ১০-১১ এপ্রিল বাংলাদেশের মুন্সিগঞ্জ জেলায় বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন তিনি। ১৯২৭ সালে *পথের দাবী* উপন্যাসটি রাজদ্রোহিতার অভিযোগে ইংরেজ সরকার কর্তৃক বাজেয়াপ্ত হয়। ১৯২৮ সালে ৫৩তম জন্মদিন উপলক্ষে ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউটে সংবর্ধিত হন তিনি। ১৯২৯ সালের ১৫ ফেব্রুয়ারি ঢাকার মালিকান্দা 'অভয়আশ্রম'-এ পশ্চিম বিক্রমপুর যুবক ও ছাত্র সম্মিলনীতে, ৩০ মার্চ রংপুরে বঙ্গীয় যুব সম্মিলনীর অধিবেশনে, ১৯৩১ সালে কুমিল্লার যুব সম্মিলনে সভাপতিত্ব ও অভিভাষণ প্রদান করেন শরৎচন্দ্র। ১৯৩২ সালে ৫৭তম জন্মদিন উপলক্ষে কলকাতা টাউন হলে নাগরিক-সাহিত্যিকদের সংবর্ধনা এবং বিশিষ্ট লেখকদের রচিত 'শরৎ-বন্দনা' রচনাসংকলন গ্রহণ করেন তিনি। শরৎচন্দ্রকে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের অভিনন্দনপত্র প্রেরণ এবং রবীন্দ্রনাথ কর্তৃক *কালের যাত্রা* নাটক উৎসর্গ এ সময়েরই ঘটনা। ১৯৩৪ সালে তিনি ফরিদপুর সাহিত্য সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন এবং

ফরিদপুর রাজেন্দ্র কলেজের ছাত্র-ছাত্রীদের প্রদত্ত সংবর্ধনা গ্রহণ করেন। এ-সময়ে তিনি বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের বিশিষ্ট সদস্য নির্বাচিত হন। ১৯৩৬ সালে বাংলা সাহিত্য সম্মেলনে সভাপতিত্ব ও অভিভাষণ প্রদান করেন। এ বছরের ২৯ জুলাই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রদত্ত সম্মানসূচক ডি. লিট. উপাধি গ্রহণ করেন শরৎচন্দ্র। ৩১ জুলাই ঢাকা মুসলিম সাহিত্য সমাজের অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব ও অভিভাষণ প্রদান এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র ইউনিয়নের সংবর্ধনা সভায় বক্তৃতা প্রদান করেন। ১৯৩৭ সালে বায়ু পরিবর্তনের জন্য দেওঘরে তিন মাস অবস্থান করেন এবং পরবর্তী সময়ে যকৃতে ক্যান্সার ও পাকস্থলীতে পচন ধরা পড়ায় নার্সিং হোমে ভর্তি হন। ১৬ জানুয়ারি (২ মাঘ, ১৩৪৪ বঙ্গাব্দ) রবিবার সকাল ১০:১০ মিনিটে শরৎচন্দ্রের জীবনাবসান ঘটে। বিরাট শোক-শোভাযাত্রা শেষে কেওড়াতলা শ্মশানে গোধূলিলগ্নে (৫:৩০ মি.) দাহ সম্পন্ন হয় তাঁর। তাঁর মৃত্যুর পর প্রকাশিত গ্রন্থদ্বয় হলো *শুভদা* এবং *শেষের পরিচয়*।

শরৎচন্দ্র মূলত হৃদয়বান শিল্পী; চরিত্র ও আখ্যান সৃষ্টিতে মস্তিষ্ক অপেক্ষা হৃদয়ের উপরেই তিনি অধিকতর নির্ভরশীল ছিলেন। সামন্ততান্ত্রিক এবং বর্ণাশ্রমভিত্তিক বাংলার হিন্দুসমাজে শোষিত ও নিপীড়িত শ্রেণির জীবন-যন্ত্রণা, বঞ্চিতা নারীর বিশেষ করে বিধবার মর্মজ্বালা, সমাজের যূপকাষ্ঠে অসহায় নর-নারীর আত্মবলিদানের চিত্রাঙ্কন এবং ব্যক্তির অধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে সুস্পষ্ট সংগ্রামী চেতনা তাঁর প্রায় সকল গল্প-উপন্যাসকে বিশিষ্ট করেছে। তাঁর লেখনী বাস্তবতাবাদ ও আদর্শবাদ–এই দুই খাতেই যুগপৎ প্রবাহিত হয়েছে। ব্যক্তি-মানসের রক্ষণশীলতা এবং শিল্পী-মনের প্রগতিশীলতা –এই দুই ধারার সম্মিলনে পরিচালিত হয়েছে তাঁর রচনাধারা।

দাম্পত্য জীবন

শরৎচন্দ্র নিজেই একস্থানে বলেছেন, 'যার হৃদয়ে ভালোবাসা আছে, সে ভালোবাসিতে জানে, সে ভালোবাসিবেই'। এই ভালোবাসার অনিঃশেষ উৎস ছিল তাঁর হৃদয়। সেজন্য বহু নারীর দিকে তাঁর ভালোবাসার অদম্য আবেগ ধাবিত হয়েছিল। কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রে তাঁর ভাগ্যে জুটেছিল প্রচণ্ড আঘাত, হতাশা, ব্যর্থতা ও নৈরাশ্য। তবু তিনি বারংবার নারীকে ভালো না বেসে পারেননি। বার্মায় আসার আগেও তিনি ভালোবাসার কঠিন আঘাত সহ্য করেছিলেন এবং এদেশে এসেও তিনি এ আঘাত থেকে পরিত্রাণ পাননি। তাঁর প্রণয় ভাগ্য মোটেই সুখকর ছিল না। নিরুপমা, গায়ত্রী ও শান্তিদেবী– এ তিন নারী তাঁর জীবনে বয়ে আনে দারুণ দহন। বাউণ্ডুলে জীবনেও পায়ে তাঁর ছেঁড়া শিকল লেগে থাকে, আবার নতুন শিকলও জড়িয়ে যায়। গার্হস্থ্য জীবনের কামনা শরৎচন্দ্রের জীবনে বরাবরই ছিল। নচেৎ তিনি একাধিক 'বিবাহ' করতেন না। তাঁর সন্তান ছিল – সন্তান কামনাও ছিল। তাই তাঁর সন্তানহীন শূন্য জীবনে রচিত গল্পের মধ্যে পরের ছেলেকে নিজের ছেলের মতো মানুষ করার ব্যাপারটি অত বেশি করে দেখা গেছে।

শরৎচন্দ্র সমাজভাঙা মানুষ। নিয়মকানুন মেনে চলা তাঁর ধাতে ছিল না। মোট কটি বিবাহ তিনি করেছিলেন এবং তা বিধিবদ্ধভাবে হয়েছিল কিনা – এসব বিষয়ে তিনি কদাচিৎ মুখ খুলেছেন ঘনিষ্ঠ মানুষের কাছে। সেই অন্তরঙ্গ আলাপ থেকে তাঁর বিবাহ-রহস্য অল্পবিস্তর জানা যায়। বার্মার বোটাটং-পোজানডং অঞ্চলের মিস্ত্রিপল্লির বাঙালিদের সম্পর্কে শরৎচন্দ্র রাধারানী দেবীকে বলেছিলেন –

> বেশির ভাগ লোকই আনুষ্ঠানিকতাশূন্য মিলনে মিলিত হয়ে বিবাহিত দম্পতির মর্যাদায় তাঁদের পরিচিত মণ্ডলের মধ্যে বাস করতেন। শরৎদা ঠাট্টার সুরে একে শৈববিবাহ বলতেন। বলতেন গান্ধর্ব বিবাহ রোম্যান্টিক প্রেম-নির্ভর। শৈববিবাহ জীবনের বাস্তব প্রয়োজন-নির্ভর। (রাধারানী, ১৯৭৬ : ৭৬)

শরৎচন্দ্রের এই উদ্বাহকর্মে কেউ পৌরোহিত্য করেছেন – এমন উল্লেখ কোথাও পাওয়া যায়নি। বার্মার বিশিষ্ট ব্যবসায়ী এবং শরৎচন্দ্রের বিশিষ্ট বন্ধু গিরীন্দ্রনাথ সরকার একই মত প্রকাশ করেছেন –

> এই পল্লীর বাঙালি মিস্ত্রিরা...সকলেরই বিবাহিত স্ত্রী সঙ্গে না থাকিলেও এখানে আপসের মধ্যে বিবাহাদির আদান প্রদান করিয়া সপরিবারে বাস করে। চট্টগ্রামবাসী বাঙালি ব্রাহ্মণগণ এই সকল বিবাহে পৌরোহিত্য করিত। (গিরীন্দ্রনাথ, ১৯৩৯ : ৩২০)

নানা সূত্র থেকে শরৎচন্দ্রের তিনটি 'বিবাহের' কথা আমরা জেনেছি। এক্ষেত্রে 'বাস্তব প্রয়োজন' নামক সূত্রটি চোখের উপর থাকলেও শরৎচন্দ্রের তীব্র ভালবাসার রূপও স্বীকার্য। শরৎচন্দ্রের মামা সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় সে প্রসঙ্গে লিখেছেন, 'ভালবাসিবার প্রচণ্ড ক্ষুধা – যাহা যৌবনে মানুষের মনকে সংক্ষুব্ধ করিয়া তোলে, [তাহা] শরৎচন্দ্রের জীবনেও একদিন উদ্দাম হইয়া আসিয়াছিল...।" (সুরেন্দ্রনাথ, ১৩৩৫ : ১৯)। এই উদ্দাম ভালোবাসার পরিচয় পাওয়া যায় স্বয়ং শরৎচন্দ্রের নিজ উক্তি থেকে। ২২ ফেব্রুয়ারি ১৯০৮সালে বিভূতিভূষণ ভট্টকে লেখা শরৎচন্দ্রের চিঠির কিছু অংশ জুড়ে আছে তাঁর দাম্পত্য-জীবনের কাহিনি, বিবাহ প্রসঙ্গ অবশ্য সেখানে উল্লেখিত হয়নি। ব্যঙ্গোক্তির ভাষায় শরৎচন্দ্র তাঁর অভিজ্ঞতার কথা লিখেছেন –

> রেঙ্গুনে দাম্পত্য প্রেমচর্চা করিতে গিয়া হঠাৎ দেখিলাম, পুরা গৃহী হইয়া পড়িয়াছি। দেড় বৎসরের মধ্যে সেই অসীম অগাধ প্রণয়ের তলা দেখি নাই। একদিন মধুর কলহ (?) বাঁধিয়া গেল এবং মানভঞ্জনের পূর্বেই দেখিলাম, গৃহিণী আমার অভিমানভরে আর একজন সুপাত্রে বরমাল্য প্রদান করিয়াছেন। এটা যে কি হইয়া গেল, আজো তাহার মীমাংসা করিতে পারি নাই। বধূ আমার ব্রহ্মদেশিনী ছিলেন না, খাঁটি স্বদেশী। যখন শুনিলাম, তিনি রজক কন্যা, তখন কান মলিয়া এক হাত নাক খত্ দিয়া ঐরাবতীতে স্নান করিয়া আসিলাম ও পরদিনই বিরহজ্বালা শান্ত করিতে হংকং চলিয়া গেলাম। আমি গৃহ, গৃহিণী, প্রণয় ও বিরহ এই আঠারো মাসের মধ্যে

> এমনি পুরাদমে ভোগ করিয়া লইয়াছি যে, তাহা হজম করিতে অন্তত আঠারো বৎসর লাগিবে। (গোপালচন্দ্র, ১৩৬৯ : ৩)

ঘটনাটির অল্পবিস্তর সমর্থন পাওয়া যায় শিবপুরে শরৎচন্দ্রের প্রতিবেশী এবং প্রেসিডেন্সী কলেজের অধ্যাপক অক্ষয়কুমার সরকারের 'শরৎ স্মৃতি' নামক 'খাতা' থেকে। শরৎচন্দ্র অক্ষয়কুমারকে ২২.০২.১৯৩০ সালে লিখেছিলেন –

> বর্মার কথা। একটি বাঙালি মেয়ে এক বস্তিতে একজন রুগ্‌ণ, কৃশ, কদাকার পুরুষকে লইয়া থাকিত। সে নানাভাবে [আমাকে] প্রণয় নিবেদন করিল। তাহার সঙ্গলিপ্সা [আমার] অত্যন্ত প্রবল হইয়া উঠিল। কয়েকদিন একত্রে কাটাইবার পর সে অন্তর্ধান হইল। আহার নিদ্রা ত্যাগ করিয়া [আমি] পাগলের মতো ঘুরিতে লাগিলাম। বাড়িউলি একদিন সহানুভূতিতে বলিয়া ফেলিল, কাহার জন্য এমনভাবে শরীরপাত করিতেছ? সে কেমন তোমাকে ঠকাইয়া তাহার বন্ধুর জন্য টাকা রোজগার করিতেছিল। এখন তাহার সঙ্গে চলিয়া গিয়াছে। তোমার উপর তাহার কখনো কিছুমাত্র দরদ ছিলনা। (গোপালচন্দ্র, ১৩৬৯ : ৮২)

রাধারানী শরৎচন্দ্রের মুখে শুনেছিলেন, বোটাটং পোজানডং-এর মিস্ত্রিপল্লিতে একটি নিয়ম প্রচলিত ছিল। অসবর্ণ নারী-পুরুষে মিলিত জীবন যাপন করলে বিবাহিত দম্পতির পরিপূর্ণ মর্যাদা পেত না। 'রজককন্যা'র সঙ্গে বসবাসকারী 'ব্রাহ্মণসন্তান' শরৎচন্দ্রের ভাগ্যেও সম্ভবত তাই ঘটেছিল। শান্তিদেবীর সঙ্গে শরৎচন্দ্রের ১৯০৬ সালে বিয়ে হয় রেঙ্গুনে। সে বিষয়ে গিরীন্দ্রনাথ সরকার লিখেছেন,'স্বজাতীয় কোনো দরিদ্র ব্রাহ্মণকন্যাকে সমাজের অবিচার হইতে রক্ষা করিবার জন্য স্বইচ্ছায় বিবাহ করিয়া [শরৎচন্দ্র] সুখী হইয়াছিলেন।' শরৎচন্দ্র যে সুখী হয়েছিলেন, তার উল্লেখ গিরীন্দ্রনাথের লেখায় পাওয়া গেলেও ঐ বিবাহ 'স্বইচ্ছায়' তিনি করেছিলেন কিনা, সে বিষয়ে সন্দেহ থেকে যায়। অনিচ্ছাকৃত হলেও শান্তিদেবী ঘরনি হওয়ার পরে শরৎচন্দ্রের সুখের ভারা পূর্ণ হয়েছিল। শরৎচন্দ্র ১৯০৭ সালে পুত্র সন্তানের জন্মের মধ্য দিয়ে সন্তান সুখও পেয়েছিলেন। কিন্তু সে সুখ তাঁর দীর্ঘস্থায়ী হয়নি। ১৯০৮ সালে রেঙ্গুনে প্লেগে আক্রান্ত হয়ে শান্তি দেবী এবং এক বছর বয়সী পুত্রসন্তান আটচল্লিশ ঘন্টার মধ্যে মারা যায়। প্লেগ রোগাক্রান্ত জনৈক দরিদ্র প্রতিবেশিনীকে সেবা করতে গিয়ে শান্তিদেবী ঐ রোগে পড়েন। শরৎচন্দ্র তখন সামান্য চাকরি করেন, মাসের শেষে শূন্য পকেট। স্ত্রীর অন্তিম সময়ে তাঁর উপযুক্ত চিকিৎসাও করাতে পারেননি তিনি। এমন কি শবদেহ শ্মশানে বহন করে নিয়ে যাওয়ার জন্য শ্মশানবন্ধুও জোটেনি। শেষপর্যন্ত গিরীন্দ্রনাথ সরকার একখানি কুরঙ্গী, মানুষে টানা ঠেলাগাড়ি ভাড়া করে শবদেহ তাতে তুলে নিয়ে শ্মশানে গেলেন। সে সময়ে শরৎচন্দ্রের মর্মঘাতী যন্ত্রণার সাক্ষী ছিলেন গিরীন্দ্রনাথ। শরৎচন্দ্র শান্তিদেবীর বুকের উপর লুটিয়ে পড়ে বলেছিলেন –

> শান্তি প্রাণের শান্তি। আমার যে আর কেউ নেই, বুক যে একেবারে শূন্য করে চলে গেছ। শান্তিহীন জগতে থেকে লাভ কি? এ যে অসহ্য জ্বালা। হা ভগবান, তুমি না মঙ্গলময় – তবে তোমার এ রাজত্বে এত অবিচার কেন? শান্তিকে হারাতে হয় কেন? কোন পাপে বুকে এ শেল বিদ্ধ করলে? (গিরীন্দ্রনাথ, ১৯৩৯ : ১৭৭-১৭৮)

পুত্রহারা পিতার দীর্ঘশ্বাস বহু বৎসর পরেও শরৎচন্দ্রের পাঁজর কাঁপিয়েছে। কবিদম্পতি তমাললতা বসু এবং গিরিজাকুমার বসুর একমাত্র পুত্রের মৃত্যু সংবাদ শুনে শরৎচন্দ্র তাদের সান্ত্বনা দেওয়ার সময়, নিজের মৃত পুত্রের উল্লেখ করে বলেছিলেন –

> তোমরা তো ভাগ্যবান পিতামাতা, আঠারো বছর ধরে পুত্রসুখ উপভোগ করে – তারপরে তাকে হারাবার যন্ত্রণা অনুভব করছ – আমি তো পুত্রসুখ উপলব্ধি করতে না করতেই পুত্রশোক কাকে বলে টের পেয়ে গেলুম। ছেলেকে পেতে না পেতেই ছ'মাসের মধ্যেই আচম্‌কা মৃত্যু এসে ছোঁ মেরে গাছ সমেত ফুলটা উপড়ে নিয়ে চলে গেল। তখন আমি কল্পনায় ওর কচি মুখে 'বাবা' ডাক প্রথম যেদিন শুনব সেদিন কেমন লাগবে ভেবে আনন্দে অধীর হচ্ছিলুম। তোমরা তো জীবনের কাছে অনেকখানিই পেয়েছ। ছেলেকে শৈশব থেকে বাল্যে, বাল্য থেকে কৈশোরে, কৈশোর থেকে তারুণ্যে তাকে নেড়ে চেড়ে এসেছ। (রাধারানী, ১৯৭৬ : ১৬১)

শরৎচন্দ্রের মৃত্যুর অব্যবহিত পরে অনুজ প্রকাশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের সততা-সার্টিফিকেট সম্বলিত যে জীবনী বাংলার ব্রাউনিং নরেন্দ্র দেব প্রকাশ করেছেন, তাতে শরৎচন্দ্রের দুই বিবাহের কথা উল্লেখ করেছেন। অথচ শরৎচন্দ্রের মামা ও আজন্ম সহচর সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় তাঁকে 'আজন্ম ব্রহ্মচারী' বলেছেন।

শরৎচন্দ্রের 'স্ত্রী' হিসেবে আমাদের কাছে পরিচিত হিরন্ময়ী দেবী। ১৯১০ সালে মেদিনীপুরের কৃষ্ণদাস অধিকারীর (চক্রবর্তী?) চতুর্দশী কন্যা বালবিধবা মোক্ষদাকে শরৎচন্দ্র দ্বিতীয় স্ত্রীর মর্যাদা দিয়ে ঘরে তোলেন। শরৎচন্দ্র তাঁর নাম দেন হিরন্ময়ী দেবী (১৮৯৬-১৯৬০)। হিরন্ময়ীর প্রতি শরৎচন্দ্র যথেষ্ট সহানুভূতিশীল ছিলেন। হিরন্ময়ীর অসুস্থতার সংবাদে তাঁর উদ্বেগ চিঠিপত্রে ইতঃস্তত বিক্ষিপ্তভাবে ছড়িয়ে আছে। মৃত্যুর আগে লেখা ইচ্ছাপত্রে শরৎচন্দ্র 'My Wife Sm. Hironmoyee Devi' বলে উল্লেখ করে তাঁকে সমস্ত স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি জীবনস্বত্বে দান করেছিলেন। শরৎচন্দ্র তাঁর জীবনকালেই কয়েকটি বইয়ের স্বত্ব হিরন্ময়ী দেবীকে প্রদান করেন এবং প্রকাশকের কাছ থেকে হিরন্ময়ী নিয়মিত রয়্যালটি বাবদ অর্থ পেতেন। এসব তথ্য থেকে মনে হতে পারে, পূর্বোক্ত দুই স্ত্রীর সঙ্গে হিরন্ময়ীকে একাসনে বসানো সম্ভব নয়; শরৎচন্দ্রের সঙ্গে এর রীতিমতো 'বিবাহ' হয়েছিল। এখানে বেধেছে তর্ক। একপক্ষে আছেন রাধারাণী দেবী, যার কাছে শরৎচন্দ্র তার রহস্যাবৃত জীবনের অনেক কথা খুলে বলেছেন; শেষ জীবনে মানসিকভাবে নিঃসঙ্গ

শরৎচন্দ্রের সঙ্গী হয়ে উঠেছিলেন। অন্য পক্ষে আছেন শরৎ-গবেষক গোপালচন্দ্র রায়, যিনি শরৎচন্দ্রের সঙ্গে সরাসরি পরিচিত না হলেও বহু তথ্য আবিষ্কার করে মূল্যবান গ্রন্থাদি রচনা করেছেন। এই বিবাহ সম্বন্ধে রাধারানী ও তার স্বামী নরেন্দ্র দেব এবং গোপালচন্দ্রের মধ্যে পরস্পরবিরোধী মত দেখা যায়। নানা যুক্তি সাজিয়ে গোপালচন্দ্র একথা প্রমাণে সচেষ্ট যে, হিরন্ময়ী সত্যই শরৎচন্দ্রের বিবাহিতা স্ত্রী। তিনি বলেছেন, হিরন্ময়ীর পিতা কৃষ্ণদাস চক্রবর্তী রেঙ্গুনে শরৎচন্দ্রের সঙ্গে হিরন্ময়ীর বিবাহ দেন। তখন হিরন্ময়ীর বয়স চৌদ্দ বছর। বিয়ের পর প্রথমে রেঙ্গুন থেকে, পরে হাওড়ার বাজে শিবপুর থেকে মাসে দশ টাকার মনিঅর্ডার পাঠিয়ে শরৎচন্দ্র তার দরিদ্র শ্বশুর মহাশয়ের আর্থিক দায়ভার খানিকটা বহন করেছিলেন। কৃষ্ণদাস শরৎচন্দ্রের বাজে শিবপুরের বাড়িতেও এসেছেন। গোপালচন্দ্রের সবচেয়ে জোরালো যুক্তি হচ্ছে – তিনি স্বয়ং হিরন্ময়ী দেবীর মুখে তার বিবাহের সংবাদ শুনেছেন। সুতরাং এসব তথ্য প্রমাণ করে, শরৎচন্দ্রের সঙ্গে তার শ্বশুরালয়ের, অন্তত শ্বশুর মহাশয়ের যোগাযোগ ছিল।

গোপালচন্দ্রের বিপরীত মেরুতে দাঁড়িয়ে রাধারানী দেবী। তিনি সুস্পষ্টভাবে লিখেছেন, শরৎচন্দ্র হিরন্ময়ীকে বিবাহ করেননি। শরৎচন্দ্রের চিঠিপত্রে হিরন্ময়ী 'বড়বৌ' নামে উল্লেখিত। কিন্তু কোনো চিঠিতে শরৎচন্দ্র তার আনুষ্ঠানিক বিবাহের কথা লেখেননি। শরৎচন্দ্র হিরন্ময়ী সম্পর্কে জোরালোভাবে বলেছেন, বড় বৌকে কেউ যদি কোনো ঘা দিতে আসে, সেটা বুমেরাং হয়ে তাকেই উল্টো আঘাতে ফেলবে। তোমাদের কোনো ভয় নেই। রেজিস্ট্রি ফেজিস্ট্রি করতে চাই না। সারাজীবনে যা করলাম না, মরার আগে সেটার ভণ্ডামি করতে পারব না। কেন শরৎচন্দ্র এই মনোভাব ব্যক্ত করেছেন, অনুমানে তার কারণ আলোচনা করেছেন রাধারানী। তাঁর মনে হয়েছে প্রেম, বিবাহ, নরনারীর মিলন সম্পর্কে শরৎচন্দ্রের দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে আমাদের মিলবে না। শরৎচন্দ্রের জীবনে প্রেম নামক বস্তুর আধার ছিলেন নিরুপমা দেবী। সেই আসনে অন্য কাউকে বসাতে শরৎচন্দ্র রাজি ছিলেন না। অপরদিকে হিরন্ময়ী শরৎচন্দ্রের 'নিঃসঙ্গ একক জীবনে একজন সঙ্গিনী বা শুশ্রূষাকারিণী। 'ব্যবহারিক জীবনের অনিবার্য প্রয়োজনে' শরৎচন্দ্র তাকে গ্রহণ করেছিলেন। তারপরও স্বামীর মতোই হিরন্ময়ীর সঙ্গে শরৎচন্দ্র আচরণ করেছেন। কিন্তু বিবাহের লোকাচার মানার প্রয়োজন বোধ করেননি। রাধারানীর পক্ষে সবচেয়ে জোরালো তথ্য মিলেছে গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এন্ড সন্সের অন্যতম স্বত্বাধিকারী হরিদাস চট্টোপাধ্যায়ের পুত্র সরোজকুমার চট্টোপাধ্যায়ের কাছ থেকে। তিনি লিখেছেন, হিরন্ময়ী দেবী অল্প বয়সে বিধবা হয়ে মেদিনীপুরের গণ্ডগ্রাম হতে কলিকাতায় এসেছিলেন। ১৯১২ সালে শরৎচন্দ্র যখন বার্মা থেকে ছুটি নিয়ে কলিকাতায় আসেন, তখন মুক্তারামবাবু স্ট্রিটে হিরন্ময়ী দেবীর সঙ্গে পরিচিত হন। বার্মায় তাঁর গৃহস্থালি চালানোর জন্য সেবাযত্নপরায়ণ একটি নারীর অভাব থাকায় তিনি অসহায় হিরন্ময়ী দেবীকে

ব্রহ্মদেশে প্রত্যাবর্তনকালে সঙ্গে নিয়ে যান। এ সম্পর্কে বিস্তারিত বিবরণ প্রমথবাবুই (শরৎচন্দ্রের বন্ধু প্রমথনাথ ভট্টাচার্য) দিয়েছেন। হিরন্ময়ী পিতৃগৃহ হতে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন ছিলেন। গোপালচন্দ্র লিখিত একটি তথ্য আংশিক স্বীকার করেছেন রাধারানী। শরৎচন্দ্র তাঁর দরিদ্র শ্বশুর মহাশয়ের জন্য সত্যই প্রতি মাসে মনি অর্ডার পাঠাতেন। তবে গোপালচন্দ্রের কথা অনুযায়ী মাসে দশ টাকা নয়, মাসে পাঁচ টাকা মাত্র। শরৎচন্দ্রের চিঠিপত্রে হিরন্ময়ী-প্রসঙ্গ ইতস্তত এসেছে। তদনুযায়ী, তিনি পতিভক্তিপরায়ণা, প্রায় নিরক্ষরা, যথেষ্ট ধর্মপ্রাণ মহিলা। শরৎচন্দ্রের মতো প্রতিভাবান মানুষের 'সহধর্মিণী' হওয়ার উপযুক্ত তিনি নন। তবু তাঁর সম্পর্কে শরৎচন্দ্রের যথেষ্ট স্নেহকাতরতা ছিল। কলকাতা থেকে তাঁকে রেঙ্গুনে নিয়ে যাওয়ার জন্য যেমন শরৎচন্দ্র ব্যগ্র, তেমনি তাঁর অসুস্থতার সংবাদে উদ্বিগ্ন বোধ করেছেন। একটি চিঠিতে তিনি লিখেছেন –

> এঁকে তো এবার পাঠানই চাই। আমারও চলে না – তাঁর তো প্রায় আহার নিদ্রা বন্ধ হইয়াছে। এই চিঠি পাইবামাত্র, ফার্স্ট অ্যাভেলেবল টিকিট রিজার্ভ করিবার ব্যবস্থা করিবে। (গোপালচন্দ্র, ১৩৬৯ : ৮৩)

হিরণ্ময়ীকে লেখা অন্য একটি পত্রে তিনি লিখেছেন :

> ভাবনা আমার তোমার জন্য, পাছে অসাবধানে অসুখ-বিসুখ করে। কারণ তোমার অসুখ করেছে যেদিন কানে শুনতে পাবো, সেইদিনই দেওঘর ছেড়ে কলকাতায় চলে যাবো। (গোপালচন্দ্র, ১৩৬৯ : ৫০৭)

এই দুই চিঠির রচনাকালের ব্যবধান বাইশ বছর। কিন্তু হিরন্ময়ীর প্রতি শরৎচন্দ্র একই রকম স্নেহশীল। চিঠিতে হিরন্ময়ীর রূপচিত্র অঙ্কন করেছেন শরৎচন্দ্র –

> আজকাল আবার আরো বিপদ-[কাজের] লোকের অসুখ, আমাকে নিজেই বাজারে যেতে হয়। না গেলে 'যিনি' আছেন, তিনি বলেন 'খেতে পাবে না'। ইনি তো দিনরাত পুজো-আচ্চা নিয়েই থাকেন, একটু আধটু লেখাপড়া জানেন বটে, কিন্তু [আমার] কাজে আসে না। একদিন বলেছিলাম, আমি শুয়ে শুয়ে বলে যাই, তুমি লিখে যাও – স্বীকারও করেছিলেন, কিন্তু সুবিধা হলো না। 'বরং' লিখতে জিজ্ঞেস করেন, অনুস্বারের ঐ টানটা ফোঁটার ভেতর দিয়ে দেব, না বাহিরে দিয়ে দেব? অর্থাৎ 'ং' হবে না '০/' হবে? (গোপালচন্দ্র, ১৩৬৯ : ৬৭)

একটি সহজ সাংসারিক চিত্রই প্রকাশিত হয়েছে এ-উক্তির মধ্য দিয়ে। বলাবাহুল্য গৃহিণী হিরন্ময়ী কোনো দিক দিয়েই সচিব, সখী এবং ললিতকলায় পারদর্শিনী ছিলেন না। হিরন্ময়ীর পতিভক্তি পতির পাদোদক পানকে অবশ্যকৃত্য করেছিল। শরৎচন্দ্র এই ভক্তির আতিশয্যে যথেষ্ট বিব্রত বোধ করেছেন। তাঁর মতো শিকল-ছেঁড়া মানুষের পায়ে হিরন্ময়ী যেভাবে শিকল বাঁধতে চেয়েছেন, তাতে তাঁর অস্বস্তি ও

বিরক্তির শেষ ছিল না। হিরন্ময়ী সম্পর্কে নরেন্দ্র দেব এবং রাধারানী দেবীকে শরৎচন্দ্র বলেছেন –

> বর্মায় যখন ছিলুম, ওর উৎপাতে মাথা ঠুকে মরতে ইচ্ছে হতো। দু-চার দিন যে বাড়ির একঘেয়েমি কাটাতে কোথাও ডুব মেরে থাকব তার উপায় ছিল না। ওর পতিভক্তি নিয়ে সেখানে সব্বাই হাসি-মস্করা করত। ওর কিছুতেই ভ্রুক্ষেপ ছিল না। দু'একদিন নিশ্চিন্ত হয়ে কোথাও নেশা করে পড়ে থাকার উপায় ছিল না। চটকা ভাঙলেই চোখের সামনে ভেসে উঠবে – একটা মানুষ উপোস করে ঘরের মেঝেয় লম্বা হয়ে পড়ে আছে। সদর দরজার কড়া নাড়লেই দরজা খুলে যাবে, সামনে থাকবে বোকা-বোকা ভীতু চোখে একটা উপোসী শুকনো মুখ। রাগারাগি বকাঝকা অনেক করেছি। কোনো ফল হয়নি। কৈফিয়তও চায়না–রাগও করেনা –শুধু ভাবনাভয়ে-ভরা ভীতু চোখে তাকিয়ে থাকে। এমনি ক'রে ওই নির্বোধ মুখ্যু মানুষটি চালাক মানুষটাকে জব্দ করে ছেড়েচে। যতোটা বোকা দেখায় ওকে আসলে তা কিন্তু নয়। (রাধারানী, ১৯৭৬ : ১৬৬-১৬৭)

শরৎচন্দ্রের নায়িকারা নায়ককে খাওয়ানোর জন্য জেদাজেদি করার কাজে পটিয়সী। তাতে খাদ্যের মশলায় প্রেমের ভিত মজবুত হয়েছে। উপন্যাসে নয়, বাস্তব জীবনে সেই একই কাজ যখন হিরন্ময়ী করেছেন, তাতে শরৎচন্দ্র হাঁপিয়ে উঠেছেন। চিঠিতে তা লিখেছেন যথেষ্ট বিরক্তি মিশিয়ে –

> এত কম খাই যে অম্বল পর্যন্ত আমার কাছে ঘেঁষে না, পাছে তাকেও বা অনাহারে শুকিয়ে মরতে হয়। কি যে সেদিন জোর ক'রে ছাই-পাঁশ কতকগুলো ঘরের তৈরি করা সন্দেশ খাইয়ে দিলে যে আজও যেন তার ঢেঁকুর উঠছে। আজ বিশ বছর আমরা কেবল খাওয়া নিয়েই লাঠালাঠি করে আসছি। ঐ খেলে না, খেলে না, রোগা হয়ে গেল–ঘর সংসার রান্নাবান্না কিসের জন্যে–যেখানে দু'চোখ যায় বিবাগী হয়ে যাব ইত্যাদি কত কি! আমি বলি, ওরে বাপু বিবাগী হবে তো শিগগির হও–এ যে শুধু আমাকে ভয় দেখিয়ে দেখিয়ে কাঁটা করে তুললে। আমি প্রায়ই ভাবি, সত্যিকার স্বর্গ যদি কোথাও থাকে তো সেখানে বোধহয় এমন করে একজন আর একজনকে খাবার জন্যে জবরদস্তি করেনা। আর তা যদি করে তো আমি যেন বরঞ্চ নরকে যাই। (গোপালচন্দ্র, ১৩৬৯ : ২১১-২১২)

নর-নারীর যৌথ জীবনে সেতু রচনা করে সন্তান। শরৎচন্দ্রের ঐশ্বর্য ভরা জীবনের একাংশে শুধু শূন্যতার হাহাকার। তাঁর আর সন্তান হয়নি। লীলারানী গঙ্গোপাধ্যায়কে লেখা একটি চিঠিতে তাঁর বঞ্চিত হৃদয়ের কাতরোক্তি প্রকাশ পেয়েছে, 'আমি ছেলেপিলে বড় ভালবাসি। আমাকে তোমার এরপরের একটি ছেলে দিও তো, আমি নিজের ধরনে মানুষ করব। দেবে?' বলা যায়, হিরন্ময়ীর সঙ্গে শরৎচন্দ্রের বিবাহ হয় বৈষ্ণব মতে, কণ্ঠিবদল করে অথবা শৈব-বিবাহ মতে। সম্ভবত তা শৈব-বিবাহই হবে। শৈব-বিবাহ এখনকার ভাষায় 'একত্রবাস'। জনৈক রজককন্যা, শান্তি দেবী, অথবা হিরন্ময়ীর সঙ্গে একত্র বসবাসকেই তিনি বিবাহের মর্যাদা দিয়েছেন। সমাজ ঐ

বিয়েকে স্বীকার করত কিনা সন্দেহ। এই কারণেই বোধহয় সভাসমিতিতে তাঁকে 'চিরকুমার' উল্লেখ করলে তিনি নিশ্চুপ হয়ে থাকতেন। এই শৈব-বিবাহকে শরৎচন্দ্র সাহিত্যিক রূপ দিয়েছেন *শেষপ্রশ্ন* উপন্যাসে; কমল-শিবনাথের সম্পর্ক চিত্রায়ণসূত্রে। কমলের উক্তি –

> বিয়ের মতো কি একটা হয়েছিল। যারা দেখতে এসেছিলেন, তাঁরা কিন্তু হাসতে লাগলেন, বললেন, এ বিবাহ বিবাহই নয়-ফাঁকি ।ওকে [শিবনাথকে] জিজ্ঞাসা করতে বললেন, বিবাহ হলো শৈব মতে। আমি বললাম সেই ভালো। (শরৎ রচনাসমগ্র, ২০০৫ : ২৪-২৫)

শরৎচন্দ্র বোঝাতে চেয়েছেন শৈব-বিবাহ নরনারীর সম্পর্কের ভিত্তি। এ-বিবাহ আনুষ্ঠানিকতায় নয়, পারস্পরিক ভালোবাসায়। ব্যক্তিজীবনে এরূপ বিবাহের রসাস্বাদ করেছেন শরৎচন্দ্র। প্রথম ক্ষেত্রে মন্দ ফল, শেষ দুটির ক্ষেত্রে ভালো ফল। নারীস্বাতন্ত্র্যে বিশ্বাসী শরৎচন্দ্র বন্ধনকে কখনো অতিরিক্ত মর্যাদা দিতে পারেননি। কিন্তু তাঁর গল্প-উপন্যাসে সামাজিক অনুষ্ঠান কিংবা সংস্কারের শক্তিকে অবহেলা করতে পারেননি। শরৎ-সাহিত্যের শিক্ষা হচ্ছে – সামাজিকতার মূল্য আছে, কিন্তু মানবিকতা আরো মূল্যবান।

রাজনীতি ও সমাজভাবনা

শরৎচন্দ্র ১৯১৯ সালে রাওলাত আইনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ-শোভাযাত্রায় শরিক হন এবং ১৯২১ সালে নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর সঙ্গে প্রথম পরিচয়ের মধ্য দিয়েই অসহযোগ আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেন । চিত্তরঞ্জন দাশের আহ্বানে তিনি কংগ্রেসে যোগদান করেন, এবং ১৯২১ সাল থেকে ১৯৩৬ সাল পর্যন্ত প্রায় ১৬ বছর তিনি হাওড়া জেলা কংগ্রেসের সভাপতি ছিলেন। দেশের স্বাধীনতা অর্জনের আন্তরিক লক্ষ্য সামনে রেখেই তিনি নিজেকে রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত করেছিলেন। হাওড়া জেলা কংগ্রেসের সভাপতি পদ থেকে পদত্যাগ ও চিত্তরঞ্জন দাশের অনুরোধে পদত্যাগ প্রত্যাহার করে নেন। দেবানন্দপুর পল্লী-সেবক সমিতির সহ-সভাপতি মনোনীত হন। ১৯২৩ সালে বরিশাল প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির অধিবেশনে যোগদান করেন তিনি। ১৯২৬ সালের ১৯-২০জুন শিলচরে সুরমা উপত্যকা ছাত্র সম্মেলনে এবং উত্তরপাড়া বিপ্লবী কর্মী-সংঘের সভায় সভাপতিত করেন শরৎচন্দ্র। ১৯৩০ সালে লাহোরে নিখিল ভারত কংগ্রেস সভায় যোগদান এবং প্রবাসী বাঙালিদের দ্বারা সংবর্ধিত হন। ১৯৩১ সালে কুমিল্লার যুব সম্মিলনে তিনি সভাপতিত্ব ও অভিভাষণ প্রদান করেন। ১৯৩২ সালে সুভাষচন্দ্র বসুর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত স্বামী বিবেকানন্দের জন্মোৎসবে বক্তৃতা এবং ১৯৩৫ সালে হাওড়া টাউন হলে 'স্বরাজ দিবস' পালন সভায় সভাপতিত্ব করেন। ১৯৩৬ সালে 'সাম্প্রদায়িক বাটোয়ারা'র বিরুদ্ধে কলকাতা টাউন হলে রবীন্দ্রনাথের সভাপতিত্বে আয়োজিত প্রতিবাদ সভায় উদ্বোধনী বক্তৃতা প্রদান করেন তিনি। রঁমা রঁলার আহ্বানে বিশ্বশান্তি সম্মেলনের জন্য

ফ্যাসিবাদ-বিরোধী ইস্তেহারে স্বাক্ষর প্রদান। ১৭ ডিসেম্বর হাওড়া জেলা কংগ্রেসের সভাপতির দায়িত্ব ত্যাগ। দেশের স্বাধীনতা উদ্ধারে বিপ্লবী প্রচেষ্টার প্রতিও তাঁর সমর্থন ছিল। এর প্রমাণ *পথের দাবী* উপন্যাস। আবার ১৯১৭ সালের রুশবিপ্লবের পরে বিশ্বব্যাপী সমাজতান্ত্রিক চিন্তাধারা যে আলোড়ন সৃষ্টি করে, শরৎচন্দ্রের মধ্যে তার অভিঘাত লক্ষ্য করা যায়। লেখক শরৎচন্দ্র যে শুধু ধর্ম-সংস্কারের দ্বন্দ্ব দেখিয়েছেন তা-ই নয়, আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত মেয়েদের মন যে কত সন্দিগ্ধ ও বিচারবুদ্ধিহীন হয় তাও দেখিয়েছেন। আধুনিক শিক্ষিতা মেয়েদের প্রতি শরৎচন্দ্র প্রসন্ন ছিলেন না। তিনি লীলারানী গঙ্গোপাধ্যায়ের কাছে আধুনিক মেয়েদের সম্পর্কে লিখেছেন–

> ঐ দূর থেকে শুনতেই...মহিলারা। উচ্চ শিক্ষিতা! দু'চার জন ছাড়া তাঁরা আমাকে মনে মনে ভারি ভয় করেন; তাঁদের কেবলই মনে হয় আমি তাঁদের ভিতরটা বুঝি খুঁটিয়ে দেখে নিচ্ছি। তাই তাঁরা আমার সামনে কিছুতে স্বস্তি পান না ...অন্তরটা তাঁদের এমনি কৃত্রিম, এমনি সঙ্কীর্ণতায় ভরা! বস্তুত এঁদের মতো সঙ্কীর্ণ চিত্ত স্ত্রীলোক বাংলাদেশে আর নেই। দিদি আমি কোন কালে খাওয়া-ছোঁয়ার বাছ-বিচার করিনে। কিন্তু ... মেয়েদের হাতে কোনকালে কিছু খাইনে। শুধু খাই তাঁদের হাতে যাঁদের বাপ-মা দু'জনেই ব্রাহ্মণ এবং বিয়েও হয়েছে ব্রাহ্মণের সঙ্গেঃ ...কিন্তু এরকম মেশানো-জাত হলে আমি তাঁদের ছোঁয়া খাইনে। তাঁরা বলেন, শরৎবাবু লেখেন বড় বড় কথা, কিন্তু বাস্তবিক তিনি ভারি গোঁড়া। ...আমি গোঁড়া নই লীলা, কিন্তু শুধু রাগ করেই এঁদের হাতে খাইনে। ... কেবল ৪-৫টি মেয়েকে দেখেছি তাঁরা সত্যিই শ্রদ্ধার পাত্রী। ...এই মেয়েদের নিন্দে করচি বলে হয়তো তোমার খুব রাগ হচ্ছে, কিন্তু জানই তো দিদি, ভেতরে ভেতরে তোমাদের প্রতি আমার কত শ্রদ্ধা, কত স্নেহ। শুধু তাঁদের ন্যাকামি, বিদ্যের জাঁক আর কুসংস্কার বর্জিত আলোর দম্ভ এবং যা সত্য নয় তার ভান, এই দেখেই আমার এত অরুচি। (নীলিমা, ২০০১ : ২১১-২১২)

শরৎচন্দ্রের মধ্যে রক্ষণশীলতার অভিযোগ বেশ পুরানো। তিনি যে হিন্দু মতাদর্শের পক্ষপাতী ছিলেন একথা অনস্বীকার্য নয়। তবে সকল প্রকার উগ্রতা ও অমানবিকতার তিনি ঘোর বিরোধী ছিলেন। ধর্ম ও সামাজিক আচরণের সর্বপ্রকার আতিশয্যই শরৎচন্দ্রের কাছে অসামঞ্জস্যপূর্ণ ও নিন্দনীয় ছিল। বিজাতীয় আচার-ব্যবহারের অন্ধ অনুকরণ ও স্বধর্ম-দ্রোহিতা তিনি যেমন পছন্দ করতেন না, তেমনি ধর্ম সম্পর্কে অতিরঞ্জিত বাড়াবাড়ি এবং বাইরে লোক দেখানো ভেক ও ভড়ংয়ের আতিশয্যও তিনি প্রতিপোষণ করতেন না। সংযত, সংহত ও শান্তভাবে স্বধর্ম আচরণই তাঁর কাছে গ্রহণযোগ্য ছিল। শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়কে একপত্রে লিখেছেন–

> কেহ কেহ এমনও বলিয়াছেন, আমি ম্লেচ্ছভাবাপন্ন, ঠিক হিন্দু নই। অথচ, হিন্দু ধর্মকে আমি এক তিলও কটাক্ষ করি নাই, ইহার গোঁড়ামিকে আক্রমণ করিয়াছিলাম মাত্র।কত লোকে কত সমালোচনা করিবেন বলিয়া ভয় দেখাইলেন, অথচ, আজ

> পর্যন্ত কেহই কিছু করিলেন না। এই সময়ে আমার এক মামা আমাকে চিঠি লিখিলেন আমি মনে মনে ব্রাহ্ম, বাহিরে হিন্দু। অথচ, আমার গলায় তুলসীর মালা আছে, সন্ধ্যা আহ্নিক না করিয়া জলগ্রহণ করি না, যার তার হাতে জল পর্যন্ত খাই না। আমি যা তাই শুধু আপনাকে বলিলাম। এসব থাকা সত্ত্বেও তাঁরা আমাকে কত যে গালিগালাজ করিলেন এবং ভড়ং করি বলিয়া শাসাইয়া দিলেন তাহা আর কত লিখিব। (নীলিমা, ২০০১ : ২১০)

রক্ষণশীল গোঁড়া হিন্দুঘরে জন্মগ্রহণ ও লালিতপালিত হয়ে ব্রাহ্মণত্বের সংস্কার অথবা গোঁড়া হিন্দুধর্মের আচার-ব্যবহার শরৎচন্দ্র মেনে চলতেন। অবশ্য তাঁর প্রশস্ত চিত্তের যুক্তিতর্ক দিয়ে তিনি এ-সকল সংস্কারের নিরর্থকতা সম্পর্কে অনেক উক্তিই উচ্চারণ করেছেন। সামাজিক আচার-ব্যবহারগুলোকে শরৎচন্দ্র কখনো অসম্মান করেননি। তিনি নিজে এ-সকল হিন্দু রীতি-নীতি সম্পূর্ণভাবে পালন না করলেও অনুসরণকারীদের কখনো অশ্রদ্ধা-অভক্তি করেননি।

নারী-পুরুষ সম্পর্কে শরৎচন্দ্রের ভাবনা

পুরুষতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় পুরুষেরা নারীকে কখনো ইতিবাচক দৃষ্টিতে মূল্যায়ন করেননি। এ প্রবণতা উনিশ শতকের বাংলার নবজাগরণের অন্যতম প্রতিভূদের মানসতায়ও দেখা যায়। ঔপনিবেশিক শাসন থেকে মুক্তি আন্দোলনে, জাতিরাষ্ট্র গঠনে এবং দেশসেবায় নারীর ভূমিকা কেমন হবে, এ সম্পর্কে সমকালীন চিন্তাবিদদের মধ্যে দেখা গেছে নানামাত্রিক দ্বিধা-সংশয় ও স্ববিরোধিতা। পুরুষতান্ত্রিক সমাজ মূলত লিঙ্গভিত্তিক সমাজ। অতএব প্রচলিত পুরুষতান্ত্রিক সংস্কৃতিও মূলত লিঙ্গভিত্তিক সংস্কৃতি। এখানে এসে ধর্ম, লোকজীবন, জনভাবনা এক হয়ে যায়। লিঙ্গভিত্তিক সংস্কৃতি বলেই পুত্রসন্তান ভালো কিছু করলে বলা হয় 'বাপের ব্যাটা' আর যদি অপকর্ম করে তাহলে বলা হয় 'চোরের মার বড় গলা'। পৌরাণিক যুগ থেকে বর্তমানকাল পর্যন্ত নারী ও পুরুষের বিচার-বিবেচনায় অভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি লক্ষ্য করা যায়। বিষয়টিকে John Mcleod দেখিয়াছেন এভাবে–

> while women are subject to representation in colonial discourses in ways which collude with partriarchal values. Thus the phrase `a double colonisation' refers to the fact that woman are twice colonized- by colonialies are representations, and by partriarchal ones too. Much postcolonial feminist criticism has attended to the representations of women created by `double colonisation', and questioned the extent to which both postcolonial and feminist discourses offer the means to challenge there representations. (সেলিনা ও বিশ্বজিৎ, ২০০৮ : ৩০১)

রামমোহন রায় এর ব্যাখ্যা দিয়েছেন এভাবে, সংসারে একজন নারী একাধারে রাঁধুনী, শয্যাসঙ্গিনী ও বিশ্বস্ত গৃহরক্ষীও বটে। বিখ্যাত নারীবাদী লেখক তাত্ত্বিক সুলামিথ

ফায়ারস্টোনের মতে, নারী ও পুরুষের মাঝে যোগ্যতার গুণ সমান। এ প্রসঙ্গে সমালোচকের মন্তব্য –

> পুরুষতান্ত্রিক সংস্কৃতি নয়, আমরা চাই জেন্ডার-নিরপেক্ষ সংস্কৃতি। যে সংস্কৃতি মানুষকে উন্নত করে, ভালোভাবে বেঁচে থাকার প্রেরণা দেয়, যে সংস্কৃতি নারী ও পুরুষের মাঝে সৃষ্টি করে পারস্পরিক ভালোবাসা ও শ্রদ্ধাবোধ–আমরা চাই তেমন সংস্কৃতি। এই সংস্কৃতি জন্যই আমাদের সম্মিলিত সংগ্রাম। (সেলিনা ও বিশ্বজিৎ, ২০০৮ : ৩০১)

রোমান্টিক কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কাছে নারীদের মেয়েলি ভাবটা থাকা জরুরি। নারীর শিক্ষা গ্রহণে তাঁর আপত্তি নেই। কিন্তু তাই বলে শিক্ষা প্রণালীতে নারী-পুরুষের কোথাও কোনো ভেদাভেদ থাকবে না – এ কথা তিনি মানতে পারেননি। নারীবিষয়ক বক্তব্যে বঙ্কিমের পথেই রবীন্দ্রনাথ হেঁটেছেন। তাঁর মতে –

> মানুষের সৃষ্টিতে নারী পুরাতনী, নারীসমাজ নারীশক্তিতে বলা যেতে পারে আদ্যাশক্তি। এই সেই শক্তি যা জীবলোকে প্রাণকে বহন করে, প্রাণকে পোষণ করে। ...প্রাণসাধনার সেই আদিম বেদনা প্রকৃতি দিয়েছেন নারীর রক্তে, নারীর হৃদয়ে। জীবপালনের সমস্ত প্রবৃত্তি প্রবল করে জড়িত করেছেন নারীর দেহমনের তন্তুতে তন্তুতে। এই প্রবৃত্তি স্বভাবতই চিত্তবৃত্তির চেয়ে হৃদয়বৃত্তিতেই স্থান পেয়েছে গভীর ও প্রশস্তভাবে। এই সেই প্রবৃত্তি নারীর মধ্যে যা গাঁথছে নিজেকে ও অন্যকে ধরে রাখবার জন্যে প্রেমে, স্নেহে, সকরুণ ধৈর্যে। (রবীন্দ্র-রচনাবলী, ১৪০২ : ৬২১)

বিপ্লবী চেতনাদীপ্ত সাম্যবাদী নজরুল বৈষম্যের বিরুদ্ধে কলম ধরেছেন বহুবার। '*সাম্যবাদী* কাব্যগ্রন্থে তিনি সাম্যের গান গেয়েছেন। নর-নারীর প্রতি সামাজিক বৈষম্যে তাঁর ঘোর আপত্তি ছিল। নজরুলের কাছে নারী সম্পূর্ণ মানুষ, অর্ধেক কল্পলোকের সৃষ্টি নয়, পুরুষের হাতে গড়া পুতুলও নয়। তাঁর নারী শাশ্বত কল্যাণী হলেও শুধু সংসারের সেবাদায়িনী হিসেবে দাসত্ব করেই জীবন কাটায় না। নারী বিষয়ে তিনি কোন প্রবন্ধ না লিখলেও, তাঁর লিখিত অভিভাষণে নারী সম্পর্কে তাঁর মতাদর্শ প্রকাশ করেছেন। সভ্যতা বিনির্মাণে ও দেশের কাজে নারীর ভূমিকাও পুরুষের সমতুল্য। এ প্রসঙ্গে নজরুল ইসলামের সাম্যবাদী কাব্যগ্রন্থের 'নারী' কবিতাটির কয়েকটি চরণ প্রণিধানযোগ্য–

> আমার চক্ষে পুরুষ রমণী কোনো ভেদাভেদ নাই ।/ বিশ্বের যা কিছু মহান সৃষ্টি চির-কল্যাণকর,/ অর্ধেক তার করিয়াছে নারী, অর্ধেক তার নর ।/ স্বর্ণ-রৌপ্য-অলঙ্কারের যক্ষপুরীতে নারী /করিল তোমায় বন্দিনী, বল, কোন্ সে অত্যাচারী? /যে-ঘোমটা তোমা করিয়াছে ভীরু ওড়াও সে আবরণ ।/ দূর করে দেও দাসীর চিহ্ন ঐ যত আভরণ ।/ (নজরুল রচনাবলী, ২০০৫ : ২৪১)

নজরুল তাঁর *মৃত্যুক্ষুধা* ও *কুহেলিকা* উপন্যাসে নারীপুরুষের রাজনৈতিক ভাবনা ও তাতে সক্রিয় অংশগ্রহণের অসাধারণ চিত্র এঁকেছেন। শরৎচন্দ্র নারীর দুঃখ যতটা বুঝেছেন, কমসংখ্যক বাঙালি লেখকই তা অনুভব করেছেন। তিনি নারীকে সর্বংসহা সত্তারূপে প্রতিষ্ঠিত করেছেন তাঁর উপন্যাসসমূহে। শরৎচন্দ্রের নায়িকা নিয়ত কষ্ট পেয়েছেন ধর্মাচারের বিধি-বিধান ও অনুশাসনে। ধর্মের বিধান অনুযায়ী আবার তারা কষ্ট থেকে মুক্তি পেয়েছেন গয়া-কাশী-বৃন্দাবনে গিয়ে। একদা যে স্বামী স্ত্রীকে খেলার পুতুলের মতো খেলে অতঃপর ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছিল তারই করুণা পুনরায় আদায় করে শরৎচন্দ্রের নারী নিজের জীবন সার্থক করেছেন। *দেনা-পাওনা*র জমিদার জীবনান্দ-ভৈরবী ষোড়শী এবং *পণ্ডিত মশাই*-এর বৃন্দাবন ও কুসুম তার উৎকৃষ্ট উদাহরণ। শরৎচন্দ্রের নারী বারবারই পরাজিত হয়েছে ব্যক্তিগত উৎকর্ষের অভাবে নয়; সামন্তবাদী আদর্শবাদের কারণে। *গৃহদাহে*র অচলা শহরের মেয়ে; আধুনিক এবং ব্রাহ্ম সমাজের সদস্য। কিন্তু নৈতিকভাবে শোচনীয় পরাভব ঘটেছে গ্রামীণ সাধারণ মেয়ে মৃণালের কাছে। মৃণাল ভারতবর্ষের হিন্দু সনাতন আদর্শের প্রতিভূ; সে ধীর-স্থির, সেবাপরায়ণা নারী; জীবনকামনাহীন অথর্ব স্বামীর সেবায় আত্মনিবেদিত। সে তুলনায় অচলা অস্থির ও আধুনিকা। তারই পরাজয় দেখিয়েছেন প্রাচীনপন্থী মৃণালের কাছে। এ যেন শরৎ-মানসতার পরিচয়বাহী। শ্রীকান্তের কাছে রাজলক্ষ্মীর সেই প্রশ্নটি খুবই মর্মস্পর্শী, যখন সে জিজ্ঞাসা করেছে,'পুরুষমানুষ যতই মন্দ হয়ে যাক, ভালো হতে চাইলে তো কেউ বাধা দেয় না। কিন্তু আমাদের বেলায়ই সব বন্ধ কেন?' কিন্তু নারীর এই ক্ষোভ কেবলই প্রশ্নের মধ্যে সীমাবদ্ধ। শরৎ নায়িকারা প্রশ্ন করে বটে, কিন্তু সমাধান দেয়না; নির্বিচারে মেনে নেয়। তাই তো তাকে বলতে শুনি,'পুরুষমানুষ চিরকালই কিছু কিছু অত্যাচারী, কিন্তু তাই বলে ত স্ত্রীর পক্ষে পালিয়ে যাবার যুক্তি খাটে না। মেয়েমানুষকে সহ্য করতে হয়। নইলে সংসারধর্ম চলে না।' *শ্রীকান্তে*র দ্বিতীয় পর্বে বার্মা যাত্রাপথে জাহাজে শ্রীকান্তর সঙ্গে পরিচয় ঘটে টগর ও নন্দ মিস্ত্রীর। টগর-নন্দ বিশ বছর একসঙ্গে সংসারধর্ম পালন করেছে কিন্তু একসঙ্গে থাকলে কী হবে, স্ত্রী টগর একদিনের জন্যেও অপেক্ষাকৃত নিম্নজাতের স্বামী নন্দকে হেঁসেলে ঢুকতে দেয়নি। এক্ষেত্রে টগরের বক্তব্য সুস্পষ্ট,'টগর বোষ্টমী মরে যাবে, তবু জাতজন্ম খোয়াবে না–তা জানো।' কিরণময়ী ঠাকুর দেবতা বিশ্বাস করে না। পুরুষকে তেমন মূল্য দেয় না। কিন্তু শরৎচন্দ্র তার পরিণতি দেখিয়েছেন মস্তিষ্কবিকৃতি। *চরিত্রহীনে*র সাবিত্রী কুলীন ঘরের বিধবা, রূপে-গুণে অতুলনীয়া। সমাজ তাকে লাঞ্ছিত করেছে; কিন্তু তবুও সে সমাজ মানে। সেজন্য সে সতীশকে বিয়ে করে না। সাবিত্রী জানে যে, তার দেহ দিয়ে আর যাই হোক সতীশের পূজা হয় না। শরৎচন্দ্রের নায়িকাদের মধ্যে সবচেয়ে আধুনিক ও প্রগতিশীল হলো কমল। রূপে-গুণে-শিক্ষা-সংযমে কমল অনুপম। তার মা বাঙালি, বাবা বিলেতি এবং তার প্রথম বিয়ে হয়েছিল এক অসমীয়া খ্রিস্টানের সঙ্গে। অপরদিকে প্রবীণ আশুতোষ

বৈদ্য আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত হলেও প্রাচীন ঐতিহ্যের ধারক ও বাহক। ফলে আদর্শগত দিক থেকে কমল ও আশুবাবু বিপরীত ভাবধারার পৃষ্ঠপোষক। কিন্তু কমল আধুনিক ভাবধারার হলেও আশুবাবুর কাছে পরাজিত হয়। তাই শেষে দেখা যায়, আশুবাবু গাড়িতে উঠলে কমল হিন্দু-রীতিতে তাকে প্রণাম করে। তখন আশীবাদ করে আশুবাবু কমলকে বলে,'নারীর মুক্তি আজও পুরুষরাই দিতে পারে। দায়িত্ব তো তাদেরই। পিতার অভিশাপের মধ্যে তো সন্তানের মুক্তি থাকে না। ...থাকে তার অকুণ্ঠ আশীবাদের মধ্যেই।' ...পুরুষতান্ত্রিক সমাজে নারীর কর্তাই হলো পুরুষ। তাই পুরুষই নারীকে মুক্তি দিতে পারে। আবার অনেক সময় পারেও না, কেননা না পারার মধ্যেই রয়েছে তার স্বার্থরক্ষা। কমলই যদি এই পিতৃতান্ত্রিক সভ্যতার বশ্যতা মেনে নেয়, তাহলে অন্যদের বেলায় তো কথাই নেই। শরৎচন্দ্র নারীদেরকে অত্যন্ত শ্রদ্ধার চোখে দেখতেন। তাই নারী-পুরুষের চরিত্র বিশ্লেষণে তিনি অত্যন্ত সংযম রক্ষা করে চলেছেন। নারী-পুরুষের যৌনজীবন বিষয়ে শরৎচন্দ্র অগ্নিপরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে তার শুদ্ধচারিতা বজায় রেখেছেন। তিনি নিজেই একজায়গায় বলেছেন–

> কিন্তু আলিঙ্গন ত দূরের কথা চুম্বন কথাটাও আমার বইয়ের মধ্যে নিতান্ত বাধ্য না হইলে দিতে পারি না। ওটা পাশ কাটাইতে পারিলেই বাঁচি। নরনারীর মধ্যে ইহাও যে আছে জানি, চলেও জানি, দোষেরও বলিতেছি না, তবুও কেমন যেন পারিয়া উঠি না। (অজিতকুমার, ২০০০ : ৩৪৬)

শরৎচন্দ্র নর-নারীর ভালোবাসা, তার হৃদয়লীলার খুঁটিনাটি রহস্য এবং তার বাহ্য অভিব্যক্তি সম্পর্কে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিশ্লেষণ করেছেন। বিশেষ করে বহু জায়গায় সমাজনিষিদ্ধ ভালোবাসার চিত্র এঁকেছেন তিনি। সেখানেও প্রত্যাশিত মিলনমুহূর্তে তিনি তাঁর লেখনীকে কঠোরভাবে শাসন করেছেন। বঙ্কিমের চরিত্রগুলির মতো কামপ্রবৃত্তির উদ্দাম হাহাকার শরৎ-সাহিত্যে পাই না। রবীন্দ্রনাথের মহেন্দ্র বা সন্দীপের মতো প্রবৃত্তিতাড়িত পুরুষও শরৎসাহিত্যে দেখা যায় না। শরৎ সাহিত্যের একমাত্র দুর্দমনীয় বাসনালোলুপ পুরুষ হলো সুরেশ। নারী চরিত্রগুলির মধ্যে কামনাতাড়িত একমাত্র নারী হলো কিরণময়ী। কামনার দাহে সে শুধু অপরকে পোড়ায়নি, নিজেও তিলে তিলে পতঙ্গের মতো দগ্ধ হয়েছে। কমল মুখে কামনার অনেক জয়গান করলেও তার ব্যক্তিজীবনে সেই কামনার কোনো উগ্র প্রকাশ দেখা যায়নি। অপর সকল নায়িকাই কামদগ্ধহীন প্রেমের নিকষিত হেমের আভায় উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। নরনারীর প্রেমের ক্ষেত্রে শরৎচন্দ্রের অবস্থান হচ্ছে শুদ্ধাচারী। তাঁর উপন্যাসে পুরুষেরা বহির্মুখী আর নারীরা অন্তর্মুখী। পুরুষশাসিত সমাজে নারীরা যে কত অসহায়, নিপীড়িত, নির্যাতিত তার একটি পরিচয় পাই দেবরের হাতে বৌদির লাঞ্ছিত হওয়ার ঘটনায়। *পল্লী-সমাজ* উপন্যাসে রমেশের উদ্দেশ্যে জ্যাঠাইমার জবানিতে উক্ত ঘটনাটি বিধৃত হয়েছে এভাবে –

> ...আমাদের এই গোবিন্দ গাঙ্গুলী সেদিন তার বিধবা বড় ভাজকে নিজের হাতে মেরে আধমরা করে দিলে, কিন্তু সমাজ থেকে তার শাস্তি হওয়া চুলোয় যাক, সে নিজেই একটা সমাজের মাথা হয়ে বসে আছে। এ-সব অপরাধ আমাদের মধ্যে শুধু ব্যক্তিগত পাপ-পুণ্য; এর সাজা ভগবান ইচ্ছা হয় দেবেন, না হয় না দেবেন, কিন্তু পল্লী-সমাজ তাতে ভ্রুক্ষেপ করে না। (শরৎ রচনাসমগ্র, ২০০৫ : ১০১-১০২)

পল্লী-সমাজের রমা কৈশোরে ভালোবেসেছিল রমেশকে। উভয়ে ব্রাহ্মণ হওয়া সত্ত্বেও বংশীয় গৌরবের পার্থক্যের কারণে তাদের মিলন হতে পারেনি। পরবর্তী সময়ে অবস্থা বৈগুণ্যে এই প্রেমের মূল্য দিতেই তাকে কাশীবাসী হতে হয়। কমললতা ২১ বছর বয়সে অবৈধ সন্তানের মা হওয়ায় তাকে ঘর ছাড়তে হয়। পরে আশ্রয় পায় মুরারিপুর আখড়ায়। কিন্তু মরণাপন্ন গহরকে সেবা করায় কলঙ্ক রটে, ফলে এ আশ্রয়টিও তাকে হারাতে হয়। কিরণময়ী ও অচলার জীবনেও ঘটেছে বিচ্ছিন্নতা ও ব্যর্থতা। স্বামীর প্রেম এ দুই নারীকে তৃপ্ত করতে পারেনি। ফলে তাদের জীবনের গুপ্তপথে আসে বিচ্ছিন্নতা। নারী-পুরুষের যৌনজীবন সম্পর্কে শরৎচন্দ্র হরিদাস শাস্ত্রীকে এক চিঠিতে লিখেছিলেন–

> নারী জাতি সম্বন্ধে আমার চরিত্র কোনকালেই উচ্ছৃঙ্খল ছিল না, এখনও নয়। নেশার চূড়ান্ত করেছি, অনেক অস্থানে-কুস্থানে গিয়েছি, কিন্তু তুমি সেসব জায়গায় খবর নিয়ে জানতে পার, তারা সকলেই আমাকে শ্রদ্ধা করতো। কেউ দাদাঠাকুর কেউ বা বাবাঠাকুর বলতো। কারণ অত্যন্ত মাতাল অবস্থাতেও তাদের দেহের উপর আমার কখনও লালসা হয়নি। তার কারণ এই নয় যে আমি অত্যন্ত সাধু, সংযত, নীতিবাগীশ,–কারণ এই যে, ওটা চিরদিনই আমার রুচিতে ঠেকেছে। যাকে ভালবাসতে পারিনে, তাকে উপভোগ করার লালসা আমার দেহে জেগে ওঠেনি কখনও। (জীবেন্দ্র সিংহ, ১৯৭৬ : ২০)

নারীর প্রতি যথার্থ সম্মান ও সহানুভূতি রেখেই শরৎচন্দ্র বলেছেন, 'শতকরা সত্তর জন হতভাগিনী (কুলত্যাগিনী) অন্নবস্ত্রের অভাবে এবং আত্মীয়-স্বজনের অনাদর, উপেক্ষা, উৎপীড়নেই গৃহত্যাগ করে, কামের পীড়নে করে না।' (জীবেন্দ্র সিংহ, ১৯৭৬ : ৪০) বিবাহের মাধ্যমে পুরুষ নারীর উপর প্রায় একচ্ছত্র অধিকার লাভ করে। এই অধিকার বলেই নারীকে তাদের নিজস্ব রুচি ও ইচ্ছা মাফিক গড়ে তোলার আকাঙ্ক্ষা দেখায় পুরুষ। শরৎচন্দ্রের উপন্যাসে প্রত্যেক পরিবারই বাল্যকাল থেকে নারীকে পুরুষতান্ত্রিক শিক্ষা দিয়ে থাকে। তারপর বিয়ের পর স্বামী-পুরুষ ব্যক্তিগত প্রয়োজনেও নারীকে অর্থাৎ নিজের স্ত্রীকে শিক্ষা দিতে চায় এবং তা গ্রহণে বাধ্য করে। আর শরৎ-সাহিত্যে শিক্ষা দেয়া অর্থে নারীর শারীরিক ও মানসিক শাস্তির বিধান করা পুরুষের বৈবাহিক অধিকারের মধ্যেই বিবেচিত হয়।

শরৎচন্দ্রের উপন্যাসে নর-নারীর সম্পর্কের প্রকাশ বহুবিচিত্ররূপে। কখনো এই সম্পর্ক স্বামী-স্ত্রী, প্রেমিক-প্রেমিকা, ভাই-বোন, পিতা-কন্যা, মাতা-পুত্র, আবার

কখনো দেবরপুত্র-জ্যেঠাইমা, চাচা-ভাতিজীর মধ্যে। তবে এ সকল সম্পর্কের মধ্যে নারী-পুরুষের স্বামী-স্ত্রী এবং প্রেমিক-প্রেমিকার সম্পর্কের রূপটিই শরৎচন্দ্রের উপন্যাসে বেশি জীবন্ত হয়ে ধরা দিয়েছে। আর এই প্রেমসম্পর্ক বৈচিত্র্যময়। স্বামী-স্ত্রীর এই প্রেমসম্পর্ক প্রধানত পারিবারিক নানা ঘটনাবলিতে, দাম্পত্য সম্পর্কের বিচিত্র জটিল রহস্যরূপে এবং দ্বন্দ্ব-সংঘাতের মধ্য দিয়ে বিশিষ্টতা পেয়েছে। (যেমন : *পণ্ডিতমশাই*, *বিরাজ বৌ*, *দেনা-পাওনা*)। শরৎ উপন্যাসে নর-নারীর বিবাহ-পূর্ববর্তী প্রেম বিচিত্র রূপে ধরা দিয়েছে। এই প্রেম সম্পর্ক কখনো অবিবাহিত নর-নারীর রোমান্টিক কাহিনিতে (*পরিণীতা* ও *দত্তা)*, কোথাও হিন্দু বিধবার সমাজনিষিদ্ধ প্রেমে(*বড়দিদি*, *পল্লী-সমাজ* প্রভৃতি উপন্যাসে), আবার কোথাও সধবা নারীর পরকীয়া প্রেমে (*গৃহদাহ*-অচলা, *শ্রীকান্ত*-অভয়া) এবং সর্বশেষে পতিতা নারীর প্রেমে (চন্দ্রমুখী, সাবিত্রী, রাজলক্ষ্মী আখ্যান)। প্রেমের এরূপ বৈচিত্র্যময় লীলারহস্য ও গভীর রসানুভূতি শরৎচন্দ্রের আগে কোনো সামাজিক-পারিবারিক উপন্যাসে রূপায়িত হয়নি। সামাজিক ও পারিবারিক জীবনে নর-নারীর বিচিত্র সম্পর্কের মধ্য দিয়ে প্রেমের যে আদর্শ বিকাশ সম্ভব শরৎচন্দ্র সেদিকে বাঙালির দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। আর প্রেমরহস্য উদ্‌ঘাটনে শরৎচন্দ্রের গভীর ও সূক্ষ্ম দৃষ্টির বিচার বিশ্লেষণ করলেই সমাজ, ব্যক্তি, যুগ ও জীবন সম্পর্কে তার দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় পাওয়া যায়। প্রেমের ক্ষেত্রে শরৎচন্দ্র সামাজিক প্রচলিত রীতি-নীতি, বিধি-বিধানকে প্রাধান্য দেননি। যে প্রেম সমাজে অবৈধ, সেই প্রেমেই তাঁর আকর্ষণ বেশি। এই সমাজ-নিষিদ্ধ প্রেমের দিকেই তাঁর সহানুভূতি ও গভীর আন্তরিকতা সহস্র ধারায় প্রবাহিত হয়েছে।

শরৎচন্দ্র বাঙালির আবেগনির্ভর হৃদয়ের সংবেদনশীল রূপকার। তিনি হৃদয়ের আবেদনকে স্বীকৃতি দিয়েছেন। সমাজের শুভাশুভ, ভালমন্দ সম্পর্কে ভালোভাবেই জানতেন। তাই বিধবার প্রেম হিন্দু সমাজে নিষিদ্ধ হলেও তিনি অত্যন্ত সহানুভূতি দিয়ে বিধবা নারীর হৃদায়াকুতিকে স্বতঃস্ফূর্তভাবে ব্যক্ত করার সুযোগ দিয়েছেন। তাকে সমাজ শাসনের শৃঙ্খলে অক্টোপাসের মতো আঁকড়ে গলা টিপে হত্যা করার কোনো যুক্তি তিনি খুঁজে পাননি। তাই রমা ও মাধবীর প্রতি তার সহানুভূতি জাগ্রত হয়েছিল। সমাজের নিষ্ঠুর বন্ধনমুক্তির জন্য ব্যক্তির মুক্তির যে আকুলতা, তা শরৎচন্দ্রকে নাড়া দিয়েছিল। তাই শরৎ-সাহিত্যে ব্যক্তির মূল্য ও গুরুত্ব অপরিসীম। বিধবারা মানুষ, তাদের মন আছে। সুতরাং ভালোবাসার অধিকারও তাদের আছে। সমাজ-সংস্কার ও প্রেমের দ্বন্দ্বে রক্তাক্ত নারী চরিত্র প্রসঙ্গে দীনেশচন্দ্র সেন লিখেছেন, 'মানুষ যে কত প্রকারে বিরুদ্ধ অবস্থাচক্রে পরস্পর বিরোধী মনোভাব লইয়া কাজ করিতে পারে, তাহা '*পল্লী-সমাজে*'র রমায় নয়, '*পণ্ডিতমশাই*'-এর কুসুম চরিত্রে দেখা গিয়েছে। ...সাবিত্রী চরিত্রের নিগূঢ় আত্মত্যাগ, নিজেকে লাঞ্ছিত করে প্রণয়ীকে পবিত্রতাদান, ...ইহা যে কত বড় প্রেমের দ্বারা সম্ভব হয়েছে, পাঠকগণ পড়ে বুঝতে পারবেন। এই ত্যাগই প্রকৃত প্রেম।' *শেষ প্রশ্নে*র অপ্রত্যাশিত প্রশংসা এসেছিল

রাজনৈতিক বুদ্ধিজীবী এম. এন. রায়ের লেখায় –একেবারে বাধাবন্ধনহারা প্রশস্তি। তাঁর কাছে 'সাহিত্য সাহিত্যই নয় যদি না তাতে মুক্তজীবন ও মুক্তচিন্তার প্রবল প্রকাশ থাকে।' *শেষ প্রশ্নে* তা হয়েছিল বলে তিনি বইটিকে কেবল নোবেল পুরস্কারের যোগ্য মনে করেননি – প্রথম ভারতীয় নোবেল পুরস্কারজয়ী রবীন্দ্রনাথের গীতাঞ্জলির চেয়ে উচ্চাসনে বসিয়েছেন। *'নিষ্কৃতি'* উপন্যাসের ইংরেজি ভাষান্তর Deliverence-এর ভূমিকায় রবীন্দ্রনাথ ভূয়সী প্রশংসা করেছেন শরৎচন্দ্রের–

> He [Sarat Chandra] has imported a new power to our language and in his stories he has shed the light of Bengal's heart revealing the significance of the obscure trilles in people's personality. He has achieved the best reward of a novelist: he has completely won the hearts of Bengali Readers. (সুদীপ বসু, ২০০০ : ১৬৮)

রবীন্দ্রনাথের এই অকুণ্ঠ প্রশংসার প্রমাণ তাঁর 'সাধারণ মেয়ে' কবিতায় লব্ধ। সেখানে শরৎচন্দ্রের নায়িকা এলোকেশীর ভাগ্যোন্নতি দেখে ঐ কবিতার নায়িকা শরৎচন্দ্রকে অনুরোধ করেছিল তাকে নিয়েও গল্প লিখতে। বঞ্চিতা নারীর দীর্ঘশ্বাসপূর্ণ এই কবিতাটিতে শরৎচন্দ্রের মানবপ্রেমিক লেখকসত্তা সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের অকুণ্ঠ স্বীকৃতি মেলে।

গ্রন্থপঞ্জি

অজিতকুমার ঘোষ (২০০০)। *শরৎচন্দ্রের জীবনী ও সাহিত্য বিচার*, দে'জ পাবলিশিং - দ্বিতীয় সংস্করণ, কলকাতা

অজিতকুমার ঘোষ (২০০০)। *শরৎচন্দ্রের জীবনী ও সাহিত্য বিচার*, দে'জ পাবলিশিং - দ্বিতীয় সংস্করণ, কলকাতা

অমলকুমার চট্টোপাধ্যায় (১৯৯৩)। *সুলভ শরৎসমগ্র*, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা

গিরীন্দ্রনাথ সরকার (১৯৩৯)। *ব্রহ্মদেশে শরৎচন্দ্র*, মিত্রালয়, কলকাতা

গোপালচন্দ্র রায় (১৩৬৯)। শরৎচন্দ্র (৩য় খণ্ড), সাহিত্য সদন, কলিকাতা

গোপিকানাথ রায় চৌধুরী (২০০০)। *দুই বিশ্বযুদ্ধের মধ্যকালীন বাঙলা কথাসাহিত্য*, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা

জীবেন্দ্র সিংহ রায় (১৯৭৬)। *শরৎ-সন্দর্শন*, জিজ্ঞাসা, কলিকাতা

নজরুল রচনাবলী (১ম খণ্ড ২০০৫)। বাংলা একাডেমি, ঢাকা

নীলিমা ইব্রাহিম (২০০১)। *শরৎ-প্রতিভা*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা

রবীন্দ্র-রচনাবলী (দ্বাদশ খণ্ড ১৪০২)। বিশ্বভারতী, কলকাতা

রাধারানী দেবী (১৯৭৬)। *শরৎচন্দ্র : মানুষ ও শিল্প*, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা

সুকুমার সেন (২০০৫)। *শরৎ রচনাসমগ্র* (১ম খণ্ড), সালমা বুক ডিপো, ঢাকা

সুকুমার সেন(২০০৫)। শরৎ রচনাসমগ্র (২য় খণ্ড), সালমা বুক ডিপো, ঢাকা

সুদীপ বসু (২০০০)। *উদ্‌ভাসিত শরৎচন্দ্র : পত্রে ও সাময়িক পত্রে*, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা

সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় (১৩৩৫)। *শরৎচন্দ্রের জীবনের একদিক*, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা

সেলিনা হোসেন ও বিশ্বজিৎ ঘোষ (২০০৮)। *জেন্ডার আলোকে সংস্কৃতি*, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা